নানা ফুলের সাজি

২



সূচীপত্র



[**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অভাব ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব মেধাবী। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়ে সংস্কৃত, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। এজন্য তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়। তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। বাংলা ভাষায় শিশুদের প্রথম পড়ার জন্য তিনি বর্ণ পরিচয় লিখেছিলেন। শুধু তাই নয় দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি স্কুল-কলেজ স্থাপন করে গেছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্নবেশে পলাইয়া কুফা নগরে উপস্থিত হইলে, যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড়মানুষের বাটির বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ?

ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক হতভাগ্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি; আপনার শরণাগত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন ; তাহার পরিচয় গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না, এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি আশ্রয় দানের পর বিষম শত্রু ও যারপরনাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন, তোমার কোন আশঙ্কা নাই, তুমি আমার আলয়ে যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম তদীয় আলয়ে আশ্রয়-গ্রহণপূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান ? তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে। শুনিয়াছি ঐ দুরাত্মা এই নগরের কোন স্থানে লুকাইয়া আছে ; বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না ; এক্ষণে গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম জগদীশ্বর আপনার বৈরনির্যাতন বাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছে। আমি আপনার পিতার প্রাণহন্তা। আমার প্রাণবধ করিয়া আপনি বৈরনির্যাতন বাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি ক্রমাগত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আপনার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই, এইজন্যই আপনি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, এইরূপ নরাধম আমি নহি।

ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনার নিকট প্রবঞ্চনা বাক্য বলিতেছি না। এই বলিয়া যেইরূপে যে স্থানে যেই অবস্থায়

গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ের সবিশেষ বর্ণনা করিলেন।

পিতৃবধ বৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদগ্রস্ত জানিয়া আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি তোমার পাথেয়স্বরূপ একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি। ইহা লইয়া অবিলম্বে আমার আলয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এইরূপ সাবধান হইয়া চলিবে যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে। সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
৩। ইব্রাহিম কে ?
৪। সলিমনই বা কে ?
৫। কুফা নগর কোথায় ?
৬। গৃহস্বামী কেন সলিমনকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন ? আর কেনই বা পরে তাঁর বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন ?
৭। আরব দেশে কি নিয়ম প্রচলিত ছিল ?
৮। 'আমি আপনার পিতার প্রাণহন্তা'—এ কথা কে কখন ও কাকে বলেছিলেন ?
৯। বাক্য গঠন কর ঃ
শরণাগত, আলয়ে, বৃত্তান্ত, অবিলম্বে।
১০। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি জান ?



[মীর মশার্রফ হোসেন ঃ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অন্রাগ জন্মে। তাঁর রচিত 'বিষাদ সিন্ধ্' বাংলা সাহিত্যের অমর অবদান। কাহিনী-কথা, নাটক, সংগীত প্রভৃতিতে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব, তন্মধ্যে অর্থচিন্তাই প্রবল, চির অভাবগুলি আশুমোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত—যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচিব না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এ-ত সকলই মহারাজ এজিদ-নামদারের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অন্তর্গত। সৈনিকবেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্য-শির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে? কার সাধ্য কে কি বলিবে?

সীমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশা যাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি রাজসংক্রান্ত কেহ হইবে মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না! সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন,

পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি, আহার্য দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, যদি অনুমতি করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার বলিল, "কি কথা ?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? আর এই বর্শাবিদ্ধ শির কোন মহাপুরুষের ?"

"ইহার অনেক কথা, তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাঁহার পিতা আলি এবং মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যাঁহার জননী ; এ তাঁহারই শির। কারবালা প্রান্তরে মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্য সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি ; পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকার পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মোহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ, এতক্ষণে জানিলাম আপনি কে, আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানাপ্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসন্ধানে থাকে, নিশীথ সময়ে, কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির, আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহা দুঃখের কারণ হইবে। আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যূষে লইবেন, আমার তত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলো বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সে সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তি হেতু সীমারের কেবল শয়ন বিলম্ব, যেমনই শয়ন, অমনই অচেতন। গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানাপ্রকার দেবদেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী। নাম "আজর"।

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া, আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহবিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম-ধর্ম-বিদ্বেষী হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন? পিতা পুত্রে সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষ মাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সেও সর্বশক্তিমানের লীলা। ইহাতে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহা মনে করিয়া হৃদয় মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হউক আর না হউক, জাতীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু পরম ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত, মহাপুরুষ মোহাম্মদের হৃদয়ের অংশ ইঁহাদের এই দশা হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়—বেদনায় অস্থির হয়, মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্মই হউক না কেন, উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে, তৎকার্যে যোগ দিতে কে বারণ করিবে? মহাপুরুষ মোহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সে পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছেন বলিয়া কি এত

তাচ্ছিল্য? জগৎ কয় দিনের? এজিদ! তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস? জীবনশূন্য দেহের সদ্‌গতির সংবাদ শুনিয়া কি তোর চির-জ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাপিত হইত না! তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনিয়া মিটিত না? হোসেন পরিবারের মহা-ক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে!—তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস্ না! তোকে কোন্ ঈশ্বর গড়িয়াছিল, জানি না; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি না! তুই সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন—কতকাল ঈশ্বরের মহত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণ হরণ করিয়াছিস্ কিন্তু তোর পিতা এমাম বংশের বিভিন্ন নহেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না! তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব? রক্ত-মাংস-বীর্য ও গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব শরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাহা যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদ্‌গতির উপায় করিবে, প্রাণ থাকিতে আজর এ শির ছাড়িবে না।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসেন বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলি ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা। এ জীবন যাক আর থাক, প্রভাত হইতে না হইতে আমরা এ পবিত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে।"

পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবনপণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিক হস্তে এ শির প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।"

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন, "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর ভক্তের মন এক, আত্মা এক। ধর্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে—রক্তে রক্তে লেশমাত্র যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর-প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। পরোপকারব্রতে জীবনপণ কথাটি শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামাস্কে লইয়া যাইতে দিব না।"

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগৎকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতেছেন, জগৎলোচন রবিদেবকে পূর্ব গগন প্রান্তে বসাইয়া আবার অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ কল্য দেখিয়াছে, আজ আবার দেখুক—নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক—পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক—সাধুজীবনের ভক্তি দেখুক—ধর্মে দ্বেষ, ধর্মে হিংসা, মানুষের শরীরে আছে কি না তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক।

ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, জায়া, পরিজনবিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিয়া থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছ জানে, জীবন থাকিতেই জীবন-লীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয়, প্রাণ দিতে হয়, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণও আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে? মানুষের পরিচয় কি? মহাশক্তিসম্পন্ন হৃদয়ে ক্ষমতা কি? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি? আজ ভাল করিয়া দেখুক।

জগৎ জাগিল। পূর্বগগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শা হস্তে দণ্ডায়মান—এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্রই যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিল, "ভ্রাতঃ, তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না, ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা, ইহার কিছুতেই একথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গতজীবন শত্রুশরীরে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ, তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু আচার কেন ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! এ সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাইসাহেব, বিড়াল তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী জগতে অনেক আছে—অনেক দেখিয়াছি; আজও দেখিলাম। তোমার ধর্মকাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা, সমস্ত তুলিয়া রাখ। কারণ ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা সীমারের আর বুঝিতে বাকী নাই; ও কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামাস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভালো চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর লোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামাস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চ হৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা এ সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?"

"ওহে ধার্মিকবর! আমি ও-সকল কথা অনেক জানি। টাকা কি জিনিস তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান

যে টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই—সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে বলত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসার আশা নাই, কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না; সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে টাকা, জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ তাহা তুমি চেন বা না চেন আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিও নেহাত মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝতে পারি! যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি?—ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?”

“রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই, তোমার সহিত বাদবিসংবাদ ও কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই; তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীন প্রজা। সাধ্য কি রাজকর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি। মস্তক পাইলেই ত ভাই তুমি ক্ষান্ত হও।

“হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি—মহারাজের নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব। আমাকে আদর-আহ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা করিয়াছ সকলই বলিব। হয়ত ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার, শীঘ্র শির আনিয়া দাও।”

আজর স্ত্রী-পুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, “হোসেনের মস্তক রাখিতে সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সাহায্যে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাঞ্চা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্বাবধানে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণ বধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-

অনুচর, রাজকর্মচারী রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে সে তিলার্ধ-কালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে ; এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

[সংক্ষিপ্ত]

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। আজর কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?
৩। সীমার কেন হোসেনের মস্তক চায়?
৪। সীমার কার কাছে এলো?
৫। আজর কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?
। সীমারের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কি জান?
৭। আজরের পত্নী কি বললেন?
৮। 'ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর ভক্তের মন এক'—কে বলেছিলেন?
৯। 'রাজদ্রোহের শাস্তি আমি বিশেষ রূপে জানি'—কে বলেছেন?
১০। এই কাহিনীর লেখক সম্বন্ধে কি জান?



[**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এক সভায় কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ভাবী কালের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অবহিত করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার ছাপ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠকালের কবিদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর রচিত 'গল্পগুচ্ছ', 'সঞ্চয়িতা', 'গোরা', 'নৌকাডুবি', 'ডাকঘর', 'ঘরেবাইরে', 'শান্তিনিকেতনে', 'জাপানের ডায়েরী', প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এঁর রচিত 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' আমাদের জাতীয় সংগীত। এঁর রচিত গানগুলি আমাদের পরম গৌরব। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী সর্বত্র পালিত হয়েছে।]

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়,

বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ ভাই মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্‌, মার খাবি। এই বেলা ওঠ।"

সে তাহাতে আরও একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ী রূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখন উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে ; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—"মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।" গুঁড়ি এক পাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য-গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল।

মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে-মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকায় গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ী কোথায় ?"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোথা।" কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা ?"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন, অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘ-বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিক দাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস্ ?"

ফটিক কহিল, "না মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস্ ?"

"কখ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশ্ন করিতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা !"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দু'টা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্?"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে তোমাদের?"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে?" বলিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পান নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদায় আশঙ্কা ছিল, কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী-একটা দুর্ঘটনা ঘটায়,

তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল, উৎসাহে তাহার নিদ্রা হয় না। অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ী পেঁাছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে

করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়। অতএব, তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও"—তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদী-তীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দল-বল উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা

মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত ; মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিতেন তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়ীগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে যাব।"

মামা বলিয়াছিলেন "স্কুলের ছুটি হোক।"

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। এক তো সহজেই পড়া তৈরী হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথা ব্যথা করিতে

লাগিল এবং গা সির সির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবেন তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে।

সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ী হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখচক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী, তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্‌ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি ?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল ; বলিল, "মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবেই দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত ; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে, এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড়

খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মাণিক আমার ?"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "আঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

অনুশীলনী

১। 'ছুটি' গল্পের ফটিক সম্বন্ধে কি জান ?

২। বিশ্বম্ভরবাবু ফটিকের কে ছিলেন ?

৩। ফটিক কলকাতায় কার সঙ্গে এসেছিল ? কেন এসেছিল ?

৪। 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে……পাঠিয়ে দাও' কে বলেছেন ? কেনই বা বললেন ? কাকে কথাটা বলা হয়েছিল ? পরের ছেলেটি কে ?

৫। ফটিকের অসুখ হলে ফটিকের কি মনে হয়েছিল ?

৬। বই হারিয়ে ফটিকের মনে কি হয়েছিল ?

৭। ফটিক গ্রামে ফিরে যেতে চেয়েছিল কেন ?

৮। ফটিককে দেখে মামীর কি মনে হয়েছিল ?

৯। ফটিক কেমন প্রকৃতির ছেলে ছিল ?

১০। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি জান ?

হাঙ্গর শিকার



স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দ ঃ কলকাতার সিমলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মসভায় ভারতের মর্যাদাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, বর্তমান জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশিনী মিস মার্গারেট নোবেল পরবর্তী জীবনে যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত—তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি ছিলেন প্রধান শিষ্য। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

সকালবেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের ছাদের উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখচে।

আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেচেন, মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার,—ক্রমে তিতি-বিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময়ে একজন বলে ঐ ঐ! দশ-বারো জন বলে উঠল, ঐ আসচে, ঐ আসচে! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসচে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নিচে।

ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা

দেখা দিল ; সে গদাইলস্করি চাল ; একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—তার আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ ; কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে, গায়ে, পেটে খেলে বেড়াচে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসেচে। ইনিই স-সাঙ্গোপাঙ্গো হাঙ্গর।

যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম আড়কাঠী মাছ, পাইলট ফিশ্। তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয় প্রসাদ-আসাদটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে, তারা যে বেশি সফল হয় তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে-পাশে ঘুরচে, পিঠে চড়ে বসচে, তারা হাঙ্গরের চোষক। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শি যোগাড় করলে। সে কুয়োর-ঘটি-তোলার ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস দড়ি দিয়ে জোর করে বাঁধলে। তাতে একটা মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে একটা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। জাহাজের নিচে একখানি পুলিশের নৌকা। সেই নৌকার উপরে আবার দুজন দিব্যি ঘুমুচ্ছিল আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্চিল। এক্ষণে তারা বন্ধু হয়ে উঠল।

হাঁকাহাঁকির চোটে তাঁরা চোখ মুচতে মুচতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময় বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি কেবল কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ ধ্বনি।

আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে, বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য সচকিত হয়ে রইলাম। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশো হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ হাঙ্গর, ঐ হাঙ্গর' রব। ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করচে, তাবৎ সেই বঁড়শি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ

করবার জন্যে পালভরা নৌকার মত সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত এলেই হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকে।

কিন্তু সে ভীম পুচ্ছ একটু হেলল—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল। আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শি-মুখো দাঁড়াল। আবার সোঁ করে আসছে—ঐ হাঁ করে বঁড়শি ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আবার হাঙ্গর শরীর দুলিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসচে, আবার হাঁ করচে; ঐ টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল, হয়েচে, টোপ খেয়েচে।

টান্, টান্, টান্, ৪০।৫০ জন প্রাণপণে টানে। কি জোর মাছের। কি ঝটপট—কি হাঁ। টান্, টান্। জল থেকে এই উঠল, ঐ জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্চে; টান্, টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল, তাইতো হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে। যেই চিতিয়েছে অমনি টানতে হয়?

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান বাঘার গা ঘেঁসে আবার একটা প্রকাণ্ড থ্যাবড়া-মুখো চলে আসচে। আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে বাঘা নিশ্চিৎ পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত।

আগে আগে চলছেন পাইলট ফিশ্ আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসচেন থ্যাবড়া; তাঁর আশেপাশে নেত্য করচেন হাঙ্গর-চোষা মাছ। এবার সব চুপ—নড়-চড় না, আর দেখ, তাড়াতাড়ি কর না। মোদ্দা—কাছাকাছি থেকো। ঐ বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখচে! দেখুক। চুপ চুপ—এইবার চিত হল—ঐ যে আড়ে গিলচে; চুপ—গিলতে দাও। তখন থ্যাবড়া অবসরক্রমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে অমনি পড়ল টান্।

বিস্মিত থ্যাবড়া মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্টো উৎপত্তি! বঁড়শি গেল বিঁধে আর ওপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর। বাপ, কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে—টান—ঐ সবটা

জল ছাড়িয়েচে ! ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধছে—ঠোঁট এফোঁড়—ওফোঁড় —টান। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিশ মাঝি ! ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে যে এত বড়ো জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ওর লেজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়।

টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেল ; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ লেজ, সাবধান ! এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুর ! বাবা, কি হাঙ্গর ! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল ! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার।

সেদিন আমার খাওয়া দাওয়া মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পটির নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
৩। তুমি কখনো শিকার করেছ কি ?
৪। এই শিকারের গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
৫। সমুদ্রে দু' একটা মাছের কথা বল।
৬। তুমি হাঙ্গর দেখেছ কি ? দেখে থাকলে বর্ণনা দাও।
৭। "সব জিনিসেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।"—এই কথাটায় তোমার কি মনে হচ্ছে ?
৮। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কি ?
৯। তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?



[**অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহোদর ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতৃদেব। শিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন। স্থাপত্য কলায় তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' প্রভৃতি তাঁর রচনা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।]

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি—তা যতই বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা—তিনিও মাথায় হীরে মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন। শেষে এমন হল, যে বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি এবং বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের তাদের টেকাই দায় হল।

কবি আসে, কালোয়াত আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গর্দানি যায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে।

উজির ভেবেই অস্থির—কি করা যায়। নাপিত-নাপ্তিনীকে উজির ডেকে বলেন, 'তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল দুগাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক।'

তারা ভয়ে শিউরে উঠে বলে, 'দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তুর চালাই এমন নেমক-হারাম আমরা নই।'

উজির নিশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন! কি উপায়। মোল্লা দো-পেঁয়াজ পেঁয়াজ-রসুন খেতে বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাষকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মসজিদে দু'বেলা ; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন, 'দেখ, এই সময় বাদশা-বেগমকে খুশি করতে পার তো কিছু হতে পারে।'

মোল্লা বল্লেন, 'তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।'

বিবি বল্লেন, 'দেখ না চেষ্টা করে। কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভাল।'

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির। দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ করে বসে আছেন। এমনকি যার দাড়ি-গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ-গান আমোদ-আহলাদ সব বন্ধ।

বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে যেভাবে ফতোয়া দেয় লোকে, সেইভাবে সুর করে গান শুরু করলেন দাড়ি নেড়ে—

আব্ দাড়ি চাপ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি,
কুল্ পাক্কা এক কাঁচ্চা
ওহি দাড়ি সবসে আচ্ছা!

বাদশা খুশী হয়ে তালে তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে মোল্লা আবার গাইলেন—

একদাড়ি মান মনোহর
একদাড়ি ভাবেবা
একদাড়ি খালিফ ফজিহৎ
একদাড়ি ঠচ্‌ঢো।

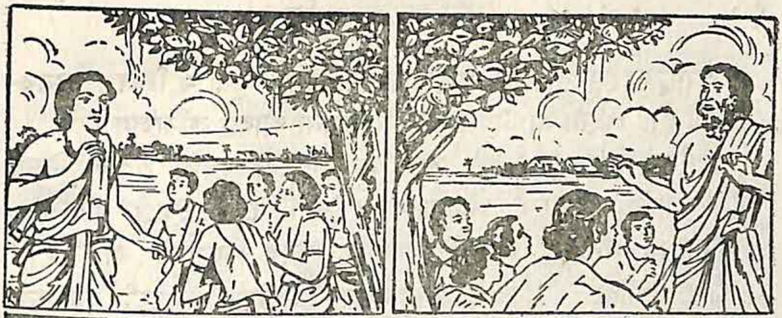
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সবসে আচ্ছা।

শুনে শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেললেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠল পর্দার আড়ালে।

একসঙ্গে বাদশা বেগম আমির ওমরাহ এবং শহরের কাঁচা পাকা যে কেউ খুশী হয়ে গেল। মোল্লার আর প্যাঁজ-রসুন ধরে না ঘরে। শহরের বাড়ি বাড়ি দাড়ির গান উল্টে লোকে গাইতে থাকলো, যার যেমন খুশী সুরে।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় বল।
২। এ গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
৩। বেগমের কি পছন্দ হল না ?
৪। বাদশার দাড়ি কি রকম ছিল ?
৫। 'সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে' কারা এবং কেন ?
৬। উজির কি বললেন ?
৭। মোল্লা কাদের বলা হয় ?
৮। বাদশা মোল্লার দিকে তাকাতে কি দেখলেন ?
৯। মোল্লা কি ছড়া গাইলেন ?
১০। হাসির রোল কি ভাবে উঠল ?



মাষ্টার মশায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[**প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :** বাংলা গল্পের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে বাড়িয়ে দেবার জন্য যে কয়েকজন সাহিত্যসাধক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণ আটপৌরে জীবনের লঘু ও দুর্বল দিক হাস্যচ্ছটাযোগে আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের। অবশ্য তাঁর বিখ্যাত গল্প 'আদরিণী ও দেবী' এর ব্যতিক্রম। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বর্ধমান জেলার ধাত্রী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল হুগলী জেলার গুড়াপ গ্রামে। ব্যারিস্টারি পাস করে প্রভাতকুমার প্রথমে দার্জিলিং ও রংপুর ও পরে গয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যোগদান করেন।

সাহিত্য জীবনের রসোজ্জ্বল মধুর চিত্র তাঁর গল্প উপন্যাসে বিবৃত আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবকথা, ষোড়শী, রমাসুন্দরী, হতাশ প্রেমিক, রত্নদীপ, সিঁদুর কোটা, মানুষ ইত্যাদি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।]

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া গোঁসাইগঞ্জের হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার, কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজী বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারী ওস্তাদ। ইংরাজীটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি ইংরাজী কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ-লোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিনই স্কুল খুলিল। পনের-ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মশায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের দেখা হইলে উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্ধমানের মাষ্টার, জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি।" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বাড়ী বর্ধমান, তিনি ত' কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন।"

উভয় গ্রামে বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা-সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখাসাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং উভয় গ্রামে প্রকাশ পাইল উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন– "ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে। ওটা ত' মহামূর্খ! আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, তখন ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়, তারপর আর ত' ইংরাজী পড়েনি। বড়বাজারে এক আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা।"

ব্রজ মাষ্টার একথা শুনিয়া বলিলেন—"একেই বলে কলিকাল! সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম। হয়েছিল কি জান? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞেস করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এনসার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম। মাষ্টার আমায় বললে,—দাও ওর কান মলে। আমি কান মলে দিতেই, ওর মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে গেল। সেই অপমানে ও-ই ত' ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ' বছর সেই ইস্কুলে পড়ে একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল হইল এই যে, উভয় গ্রামের লোকই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাক্।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচারসভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজী কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ই তুল্যমূল্য। একজন অন্যজনকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন। বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, স্থান—বটবৃক্ষতল, সময়—সূর্যাস্ত।

ধার্য দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটি বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন—"কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন তার মানে বলতে না পারে!" ব্রজ মাষ্টার বলিলেন—"আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি। এমন কশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো যা' শুনে হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে ত' দূরের কথা।"

দত্তজা বলিলেন—"দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব!"

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদেরও সঙ্গে ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে

ছুড়িয়া দিবেন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথাকরিয়া পড়িবে সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

হীরু দত্ত মহাশয় ছড়ি সজোরে ঘুরাইয়া উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হারাণ মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, এর মানে কি—

HORNS OF A DILEMMA (হর্নস্ অব্ এ ডায়লেমা)।

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—"এর মানে—'উভয়-সঙ্কট'। কেমন কি না।"

"পেরেছে, পেরেছে, আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন।

ব্রজ মাষ্টার দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শোনো হারাণ বাবু, আমি তোমায় কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেব, সেটা আমার মনঃপূত নয়। আমি যে কথার মানে জিজ্ঞাসা করব—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—

"**I DON'T KNOW** (আই ডোণ্ট্ নো)।"

হারাণ মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিলেন—"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল—দু'-ও।"

হারাণ মাষ্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া ও রামশিঙ্গা সমানভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জের কয়েকজন বলশালী লোক ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জের ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহতভাবে মাষ্টারি করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। দুই গ্রামের মস্টারমশায়ের নাম কি? গ্রামের নাম কি কি?
২। কি ভাবে দুই মাস্টারমশায়ের দেখা হয়েছিল? তখন কি উৎসব ছিল?
৩। দুই গ্রামের দুই মাস্টারের বিদ্যার পরীক্ষা কি ভাবে হয়েছিল?
৪। দুই মাস্টারের বিদ্যার পরীক্ষার জন্য কি আয়োজন হয়েছিল?
৫। ব্রজ মাস্টার কি বলে নিজের বিদ্যা জাহির করেছিলেন?
৬। হারাণ মাস্টার ব্রজ মাস্টারকে কি প্রশ্ন করেছিলেন?
৭। ব্রজ মাস্টার কি প্রশ্ন করেছিলেন?
৮। দুই মাস্টারমশায়ের মধ্যে কে জিতেছিলেন? ফল কি হয়েছিল?
৯। হারাণ মাস্টার পরীক্ষায় হেরেছিলেন কেন?
১০। গ্রামবাসীদের কি অবস্থা হয়েছিল?

নতুন-দা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ** অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র ধনীর-দুলাল ছিলেন না। দারিদ্র্যের নিপীড়নের জন্যই শিক্ষার পথে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি। অল্প বয়সেই তাঁকে অর্থোপার্জনের দিকে মন দিতে হয়। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে একটি এস্টেটে সামান্য চাকরিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু অস্থিরমতি শরৎচন্দ্রের মন সংসারে আবদ্ধ থাকল না। তাই সন্ন্যাসী বেশে তিনি বেশ কিছুদিন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ১৯০২ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বড়দিদি'ই তাঁর প্রথম ও জনপ্রিয় উপন্যাস। রামের সুমতি, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। জাদুকরের মতো তিনি বাঙালীর হৃদয়কে জয় করলেন। তাঁর গল্পকাহিনীতে পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধী-চরিত্রকে, পারিবারিক স্নেহের বিচিত্র গতিকে, জটিল হৃদয়ের রহস্যকে গভীর দরদ দিয়ে অপরূপ করেছেন। তাঁর ভাষা সরল ও প্রাণরূপী। তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশায়, পল্লীসমাজ, পথের দাবী, দত্তা, গৃহদাহ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস, শেষপ্রশ্ন, চরিত্রহীন, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত (চার খণ্ড) ইত্যাদি প্রধান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন আর কোন সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অমর কথাশিল্পী ১৯৩৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন।]

দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছি,—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পোঁছিলেন। চাঁদের

আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

"তোর নাম কিরে?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত; শুধু কান্ত! নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোড়াটাকে দে তামাক সাজুক।"

ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজ্‌ছি।" আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন "তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি।"

"আমি দিচ্চি নতুন-দা। আমার শীত করবে না—এই নাও!" বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়, আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন-দা এ যে ভারী মুস্কিল হ'ল, হাওয়া পড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।"

কলিকাতাবাসী নতুন-দার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র হঠাৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দাঁড়! কারুর সাধ্য নেই নতুন-দা এই রেত ঠেলে উজান বেয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা এক মুহূর্তেই অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আসলি কেন হতভাগা ? যেমন ক'রে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতে হবে—তারা বিশেষ করে ধরেছে।"

ইন্দ্র কহিল, "তাদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।"

ইন্দ্রের সঙ্কট অবস্থা অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না ?" কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, "তবে যাও না টান গে না হে। জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন ?"

তারপরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন। এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হাল ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া ধরাতে পারবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, "না, খুলে—"

"হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি। নে—যা করছিস্ কর।"

আরও বিপদ, গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল। বলিলেন, "হ্যাঁরে ইন্দ্র এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই ? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না ?"

ইন্দ্র কহিল, "সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুন-দা। সব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা, লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐঃ—টান্ না একটু জোরে —ভাত খাসনে ?"

অনতিকাল পরে আমরা একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ডিঙি জোর করিয়া ধাক্‌কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাবু কহিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার।" অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধা শান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রের জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে খাটাইতে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই যে শূন্য! ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে। কিন্তু ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"নতুন-দা।" কিন্তু কোথায় কে? এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের উৎপাতের কথা শোনা যাইত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, "বাঘে নিলে না ত রে?"

সহসা উভয়ের চোখে পড়িল, কিছুদূরে বালির উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্‌ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁহারই বহু মূল্য পাম্পসুর একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—"শ্রীকান্তরে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না।"

তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলো যে সমবেত আর্তচীৎকারে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই আমাদের গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত বুঝিতে পারিলাম। এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয় রহিল না যে, নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাঁহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া কুকুরগুলি এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব।"

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, "পাগল হয়েছ ভাই ?"

একটা ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া সে কহিল, "তুই থাক শ্রীকান্ত, আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললুম।"

আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই, আমিও ত নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। একটা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাহার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

সম্মুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়া দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে।

যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া, বাঘ তো দূরের কথা, একটা শৃগালও নেই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নতুন-দা।" নতুন-দা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, "এই যে আমি।" দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার শহুরে দাদাটিকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প্-সু, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি ; ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা চলিয়া গেলে গ্রামের কুকুরগুলো তাঁহার অদৃষ্ট-পূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাতে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেই সে রাত্রে আমাদের কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই

যে, বাব্‌ ডাঙায় উঠিয়াই প্রথমে কথা কহিলেন—'আমার একপাটি পাম্প্‌-স্‌ ?'

[সংক্ষিপ্ত]

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় লেখ।
২। নতুনদা সম্বন্ধে কি জান ?
৩। নতুনদা লোকটিকে কেমন লাগে ?
৪। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের বন্ধুত্ব কিরূপ ছিল ?
৫। ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও নতুনদা এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে কোন্‌টি ?
৬। ডিঙ্গি আর নৌকার পার্থক্য কি ?
৭। আমার একপাটি পাম্প-স্‌ ?—কে কখন এ কথা বলেছিল ?
৮। নতুনদা শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কি কি পোশাক পরেছিলেন ?
৯। গল্পের মূল বিষয় কি ?
১০। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কি জান ?



[**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :** ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুলালয়ে কাঁচড়াপাড়া হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ গ্রাম জীবনে শিক্ষকতা করতেন ও সাহিত্যসেবার মাধ্যমে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। বিভূতিভূষণ আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণসাহিত্যিক। তাঁর রচিত 'পথের 'পাঁচালী' অমর গ্রন্থ। ইনি ছোটদের জন্য 'আম আঁটির ভেঁপু', 'মরণের ডংকা বাজে', 'চাঁদের পাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। 'আরণ্যক', 'দেবযান', 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'অপরাজিতা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।]

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে-মাঝে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়। কোন্ দেশ এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মায়ের মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে!

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দভাবের সৃষ্টি করিত। এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা যখন তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া যেন কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে, ঠিক সেই সময় মায়ের জন্য তাহার মন বড় কেমন করিয়া উঠিত; হঠাৎ—তাহার মনে হইত

যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এরকম হইয়াছে!....আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে—ছোট্ট—ছোট্ট—আরও ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে! চাহিয়া দেখিতে-দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাড়ি হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত! মা বলিত দ্যাখো দ্যাখো ছেলের কান্ড দ্যাখো! ছাড়্—ছাড়্—দেখেছিস সক্‌ড়ি হাত?........ছাড়ো মানিক আমার—সোনা আমার! তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়ি মাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়ি মাছ ভাজা ভালবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করো না—ছাড়ো······

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখতে-লিখতে একমনে মায়ের মুখে মহাভারত—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যায়। বেলা পড়িলে, মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক-একদিন চাহিয়া দেখে—কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে, আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনো মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে....রোজই তোলে···রোজই তোলে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে খুব কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা গাছের ডালকে অস্ত্ররূপে হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশ বাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো—একেবারে দশ বাণ

ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি—একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর ওঃ—সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! তারপর অর্জুন করলেন কি—ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন, বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না।

গ্রীষ্মকালের দিন—বৈশাখের মাঝামাঝি!

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ও কিরে অপু? অপু চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বকছিস্ বিড়বিড় করে, আর হাত পা নাড়ছিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভায়ের কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!........কোথাকার একটা পাগল, কি বকছিলিরে আপন মনে? অপু লজ্জিতমুখে বারবার বলিতে লাগিল—যাঃ, বকছিলাম বুঝি? আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—পরে সে তাহার হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিস্? কত নোনা পেকেছে? এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি—

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি! একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর্, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকশিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকশি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনছি—

অপু আঁকশি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-

পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না। খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল দুর্গা আঁকশি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো, মা'র হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকশিটা নে। নোলক পরবি? একটা নিচু ঝোঁপের মাথায় ওড়্কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি। তাহার দিদি ওড়্-কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গলে সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে—নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের উভয়েরই খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

দুর্গা একটা কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, নিজেও একটা পরিল, পরে ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া মুখ নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েচে—চল্ মাকে দেখাইগে।

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল্ না, খুলে ফেলিস্‌নে যেন, বেশ হয়েছে!

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনা ফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল—সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

এদিকে দ্যাখো মা—অপু নোলক পরিয়া দিদির পেছনে দাঁড়াইয়া

আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ওমা! ও আবার কে রে? কে, চিনতে তো পারছি নে!

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল, বলিল—ওই দিদি পরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গা—হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগ্‌ডুগি বাজছে, চল্ বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক, শিগ্‌গির আয়—আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া—বাঁদর নয়, ও পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা ও অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ি গিয়া মাথার রেকাবি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা পোলা আছে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতেই মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহারা পুজার জন্য লইলেন, ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্য খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে!

চিনিবাস রেকাবি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল।

দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে টনুদের বাড়ি।

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কি হ্যাংলা স্বভাব। নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না। তা না লোকের দোর-দোর—যেমনি মা তেমনি ছা!

ইহাদের বাড়ির বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেব—তুই দুটো—আমি দুটো! তুই আমি মুড়কি কিনে খাবো।

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের কতদিন আছে রে দিদি?

অনুশীলনী

১। 'গ্রীষ্ম দুপুর' বলতে কি বোঝ?
২। এ কাহিনীর নায়ক কে?
৩। অপু কে?
৪। এ গল্পের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা কর।
৫। মহাভারতের কি কাহিনী বর্ণনা হয়েছে?
৬। দুর্গা কে?
৭। অপু দুর্গা কি করল?
৮। ভুবন মুখার্জী কে?
৯। সেজ বউ দুর্গা সম্বন্ধে কি বলল?
১০। এ গল্পের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে তোমার কি মত?

খাজাঞ্চি বাবু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



[**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক ও গল্প রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পর এঁর কৃতিত্ব সমধিক। এঁর রচিত গণদেবতা, রাইকমল, কবি, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।]

মানভূম জেলার ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানার একটা মেস। খাপরায় ছাওয়া একটা লম্বা ব্যারাকের ধরনের একখানা বাংলো, সামনে সারি সারি থামওয়ালা একফালি টানা বারান্দা। সেই বারান্দার উপর বসিয়া কর্মচারীরা সকলে আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শীতকালের প্রাতঃকাল, সাড়ে ছয়টায় কারখানার ভোঁ বাজে। অশ্বিনী চা খায় না, সে গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছিল; ভিখারী আউটডোরে কাজ করে, সে নীল রঙের প্যাণ্টটা পরিয়া মোজা জোড়াটা খুঁজিতেছিল; তরুণ বদি রোজ পঁচিশটা ডন ফেলে, সে একাদশ ডনটি ফেলিতেছিল; বুড়া শশী মিস্ত্রী গতরাত্রের উদ্বৃত্ত মাংসের চর্বিগুলো গিলিতেছিল। ঠিক এই সময়েই কারখানার ভোঁ বাজিয়া উঠিল—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ।

শেষ সিটিই তো বটে, থামিয়া থামিয়া বাজিতেছে। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ছুটিল। ম্যানেজার নূতন লোক, সাহেবী মেজাজ; তাঁহার নূতন বন্দোবস্তে নিয়ম হইয়াছে, সাড়ে ছয়টার সিটি

বাজিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলকে আপিসে আসিয়া হাজিরা-বই সহি করিতে হইবে। তাহার অধিক এক মিনিটও বিলম্ব হইলে অর্ধেক দিন অন‍ুপস্থিত লেখা হইবে। বদি একাদশ ডনটাতে ব্যায়াম শেষ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, স্লেভারি, ওঃ! সে তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আপিসে আসিয়া সে দেখিল, সেখানে রীতিমত য‍ুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার খাজাঞ্চিকে বলিতেছে, হ‍ু আর ইউ? তুমি কে? হোয়াট রাইট—কে তোমাকে সিটি দেবার হ‍ুকুম দিতে রাইট দিয়েছে? হ‍ু আর ইউ?

বদি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরী আছে, অর্থাৎ প্রায় দশ মিনিট প‍ূর্বে সিটি দেওয়া হইয়াছে। রক্ত যেন তাহার মাথায় চড়িয়া গেল, সে ঘ‍ুসি পাকাইয়া খাজাঞ্চির নাকের কাছে আসিয়া বলিল, ইয়ে কোথাকার!

কি হয়েছে আপনাদের? ন‍ূতন ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ হইয়া গেল। ব‍ৃদ্ধ খাজাঞ্চি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঈষৎ উৎসাহের সহিত বলিল, সার্, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি প'ড়ে আছে, গাড়ি লোডিং শেষ হয়নি, দশ নম্বর কিলেন—

বাধা দিয়া ম্যানেজার বলিলেন, সে হিসেব আমি চাইনি। আমি জানতে চাই, এ গোলমাল কিসের জন্যে?

খাজাঞ্চি অবাক হইয়া গেল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শ‍ুধ‍ু। সার্ভেয়ার সকলের মধ্যে পদস্থ ব্যক্তি, সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, সার্, কাল থেকে আপনি অর্ডার দিয়েছেন, সকাল সাড়ে ছয়টায় কাজ আরম্ভ হবে, আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হলে হাফ-ডে'জ ওয়ার্ক কাটা যাবে। শীতকালের দিন সার্, আর খাজাঞ্চিবাব‍ু এসে ছটা কুড়ি মিনিট—মানে দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হ‍ুকুম দিয়েছেন। আমাদের কারও খাওয়া হয়নি সার্, ম‍ুখের চা পর্যন্ত ফেলে এসেছি।

ম্যানেজার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে-ছয়টার তখনও দ‍ুই মিনিট বিলম্ব আছে। নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে ঘড়িটা ঠিক তাহাই বলিতেছে। ম্যানেজার বলিলেন,

ওয়েল, আধ ঘণ্টা কাজ ক'রে আপনারা আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজ চালু করে দিন। তারপর গিয়ে সব খেয়ে আসুন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনাদের আজ ছুটি থাকল। যান—যান সব।

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই আপিসটা পরিষ্কার হইয়া গেল। খাজাঞ্চি আপনার আসনে গিয়া বসিল।

ম্যানেজার বলিলেন, আপনি দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন?

খাজাঞ্চি বলিল, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি আছে সার্, লোডিং শেষ হয়নি, দশ—

অসহিষ্ণুভাবে ম্যানেজার বলিলেন, সে সব আমি জানি, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তারই উত্তর দিন।

ফ্যালফ্যাল করিয়া ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া খাজাঞ্চি বলিল, হ্যাঁ সার্!

কেন? ঘণ্টা বা সিটি দিতে হুকুম দেওয়ার ভার তো আপনার ওপর নেই।

কাল থেকে অনেক কাজ বাকি প'ড়ে আছে সার্, লোডিং শেষ হয়নি, দশ নম্বর কিলেন—

আপনি কি কারখানার মালিক?

না সার্।

আজ আপনাকে মাফ করলাম, কিন্তু এমন যেন আর না হয়। ম্যানেজার গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। শীতের দিনেও খাজাঞ্চি ঘামিয়া উঠিয়াছিল। বেচারী কপালের ঘাম মুছিয়া আপনার কাজে মন দিল। ক্যাশবাক্সের উপর একটি প্রণাম করিয়া খাতা খুলিয়া বসিল।

খাজাঞ্চিবাবু টাকাটা আমাকে জলদি দিয়ে দিন তো।—স্টোর ডিপার্টমেণ্টের পিওন একখানা ভাউচার ফেলিয়া দিল। ম্যানেজারের সই-করা ভাউচার, এক শো দশ টাকা হইবে।

খাজাঞ্চি বলিল, এত টাকা কি হবে?

খড় কিনতে হবে।

তা—দাঁড়াও বাপু, একবার শুধিয়ে আসি। ভাউচারখানি

হাতে করিয়া খাজাঞ্চি ম্যানেজারের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ভয় হইতেছিল, সে ফিরিল। কিন্তু আবার ফিরিয়া গিয়া বাহির হইতে ডাকিল, সার্।

আসুন।

এই ভাউচারটার টাকা—

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, টাকা কি কম আছে?

মাথা চুলকাইয়া খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে না, তবে—

তবে? আজ কি কোন পেমেণ্ট আছে?

আজ্ঞে না, দোব কিনা তাই শুধোচ্ছি।

সবিস্ময়ে খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার বলিলেন, মানে—হোয়াট ডু ইউ মীন? ভাউচার যখন সই করেছি, তখন তো আমি দিতে বলেছি।

একটা সেলাম করিয়া খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্যানেজার আন্দোলিত পর্দাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইডিয়ট!

বাক্স খুলিয়া টাকা গুনিয়া গাঁথিয়া পিওনকে দিয়া খাজাঞ্চি বলিল, সই কর।

পিওন সই করিয়া দিল। টাকা লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু খাজাঞ্চি বলিল, শোন শোন।

কি?

দাঁড়াও তো, আর একবার গুনে দেখি, ভুল হ'ল না তো!

আবার দেখিয়া শুনিয়া দিয়া খাজাঞ্চি খাতায় খরচ লিখিল, স্টোর-খাতে খরচ। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সার্!

আসুন। কি? কি বলছেন আবার?

আজ্ঞে, খড়ের টাকাটা দিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার অবাক হইয়া খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খাজাঞ্চি সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বারোটার ভোঁ বাজিল। স্নানাহারের জন্য এখন দেড় ঘণ্টা ছুটি। মেসে আসিয়া

খাজাঞ্চি আপনার নিয়মমত জুতা জোড়াটি ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে খুলিয়া রাখিল। তারপর গায়ের জামা খুলিয়া ঘটি ও গামছা হাতে বারান্দার তিন নম্বর থামের খাটালটিতে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিল। স্টোরকিপার ওদিকে তেল মাখিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, বোদ্‌দা, নতুন সাহেব লোক কেমন ?

খাজাঞ্চির নামও বদিবাবু। খাজাঞ্চি উত্তর দিল, ভাল লোক, পাকা লোক। চিঠি যা আজ লিখছিল খসখস ক'রে—জলের মত কলম চলছে যেন।

বালতি ও ঘটি হাতে খাজাঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইল। লম্বা বারান্দায় জল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে একটি করিয়া লোহার জালা রক্ষিত ছিল, খাজাঞ্চি প্রত্যেক জালা হইতে দুটি ঘটি করিয়া জল তুলিয়া নিজের বালতিটি ভরতি করিয়া লইল। তারপর—সম্মুখের প'ড়ো জমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাথরটায় স্নান করিতে বসিল।

ও-পাশে ম্যানেজার সাহেব তখন ঘর দেখিতে ঢুকিলেন। সমস্ত ঘর মেরামত ও চুনকাম করিতে হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। খাজাঞ্চি স্নান সারিয়া আসিয়া ঢুকিল—জয়, জয় মা কালী। সে গামছা পরিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। ঘরে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া। ম্যানেজার বলিলেন, আপনি এ ঘরে থাকেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ সার্, আর গোবিন্দ থাকেন।

কিন্তু এ কি রকম ভাবে সীট সাজিয়েছেন—একটা উত্তর-দক্ষিণে, একটা পূর্ব-পশ্চিমে ? এই, এই খালাসী, এই সীটটা ঘুরিয়ে দে তো—এইটাকে উত্তর-দক্ষিণে করে দে। এ কি, ঘরের মাঝখানে জুতো ?—বলিয়া তিনি নিজেই পায়ে করিয়া জুতো-জোড়াটা একপাশে ঠেলিয়া দিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকজনসহ ম্যানেজার বাহির হইয়া গেলেন। খাজাঞ্চির সীটটাই ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সেই গামছা পরিয়াই বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার তখন শশী মিস্ত্রীর ঘরে তামাকের গুল ও দেয়ালে হাত-মোছা তেল-কালি ও মাংসের হলুদের দাগ লইয়া পড়িয়াছেন। তাহার প্যাণ্টের পিছনে পর্যন্ত হলুদ ও কালির দাগ।

সার্ !

ম্যানেজার ফিরিয়া দেখিলেন, খাজাঞ্চি। বলিলেন, কি বলছেন? কাপড় ছাড়েন নি এখনও আপনি? যান যান, কাপড় ছেড়ে আসুন।

সার্ আজ চৌদ্দ বছর আমার সীটটা এমনিভাবে আছে সার্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন, কি বলছেন আপনি?

আমার সীটটা—

হঠাৎ রুষ্ট হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, না না, আপনার জন্যে অন্যের অসুবিধা হতে পারে না।

খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রুমমেট গোবিন্দ স্নানান্তে চুল আঁচড়াইতেছিল, সে বলিল, কাপড় ছাড়ুন।

খাজাঞ্চি বলিল, একবার তক্তাপোশটা ধর তো ভাই গোবিন্দ!

গোবিন্দ অত্যন্ত ভাল মানুষ, সে বলিল, ম্যানেজার বাবু যে—

ততক্ষণে তক্তাপোশের একপ্রান্ত ধরিয়া খাজাঞ্চি বলিল, ওরে বাবা, এই কারখানায় এসে অবধি এই ঘরটাতে—এই তক্তায়—ওই পূর্ব-শিয়রে আমি আছি, ও আমি বদল করব না।

গোবিন্দ আর প্রতিবাদ করিল না। তক্তাপোশের অপর প্রান্তটা আসিয়া সে ধরিল।

তক্তাপোশটা যথাস্থানে ঘুরাইয়া পাতিয়াই খাজাঞ্চি সর্বাগ্রে জুতা-জোড়াটি তুলিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া রাখিয়া দিল!

সন্ধ্যার সময় খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া—ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিষম চটিয়া বলিল, নাঃ, এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা। আচ্ছা, হুঁকো কে নামিয়ে দিলে আমার? গোবিন্দ বলিল, ম্যানেজারবাবু। আবার সন্ধ্যেবেলায় এসেছিলেন। বিশেষ ক'রে বলে গেলেন, হুঁকো ওখানে রাখবেন না। তক্তাপোশ ঘুরিয়েছেন, ঘুরিয়েছেন, জানালায় হুঁকো আর ঘরের মাঝখানে জুতো—এ রাখা হবে না।

জুতো জোড়াটা ঘরের মধ্যস্থলেই খুলিয়া রাখিয়া খাজাঞ্চি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তক্তাপোশটার উপর বসিয়া পড়িল। আবার উঠিয়া সে জুতা-জোড়াটা সরাইয়া রাখিল।

পরদিন সকালবেলা। খাজাঞ্চি ঘড়ির কাছে চেয়ার লইয়া কি করিতেছিল, জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ম্যানেজার নিজের হাত ঘড়িটা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে।

সেদিন অ্যাকাউণ্ট্যান্ট অশ্বিনী ম্যানেজারকে খাতাপত্র দেখাইতেছিল। ক্যাশখাতা দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, এ কি? এ কি লেখা? আর লাইন আরম্ভ হয়েছে এখানে, শেষ হ'ল গিয়ে দু'ইঞ্চি বেঁকে এসে এখানে? এ কি?

অশ্বিনী বলিল, খাজাঞ্চিবাবু চোখে ভাল দেখতে পান না; আবার চশমাও নেবেন না; বলেন চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

ম্যানেজার হাঁকিলেন, বেয়ারা। খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার বলিলেন, কত বয়স হল, আপনার?

ষাট, সার্। এই কোম্পানিতেই চল্লিশ বছর চাকুরি করছি, এ কারখানায় চৌদ্দ বছর—গোড়া থেকেই, তখন এগুলো ডাঙ্গা ছিল, মানুষ আসতে ভয়—

ততক্ষণে অসহিষ্ণু হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, থামুন, ও কথা নয়। আমি বলছি এত বয়স হ'ল, চোখে দেখেন না, তবু চশমা নেন না কেন! এ কি—এ কি! এ রকমভাবে কাজ চলবে না মশায়।

নোব সার্, চশমা আমি নোব সার্। খাজাঞ্চি চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বলিল সার্, একবেলা যদি ছুটি দেন সার্, আসানসোলে মোটর যাচ্ছে—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই ম্যানেজার বলিলেন, যান।

সন্ধ্যায় চশমা চোখে খাজাঞ্চি প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিল, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। কেমন হ'ল বল দেখি? এক দুই তিন চার। চালের বাতা গুনিতে আরম্ভ করিয়া দিল খাজাঞ্চি।

দিন কয়েক পর। ম্যানেজার খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিলেন, বড় দুঃখিত আমি খাজাঞ্চিবাবু আপনার চাকুরিতে জবাব হচ্ছে। মানে, কোম্পানি আপনাকে রিটায়ার করতে অনুরোধ ক'রে পত্র দিয়েছে। ইংরেজীতে অ্যাকাউণ্ট রাখা হবে। আর ধরুন আপনার চাকুরিও

হ'ল অনেক দিন, এখন নতুন লোককে জায়গা দিন। কেমন ? লোকও এসে গেছে আমাদের। বলিয়া কোম্পানির চিঠি ও পদত্যাগ পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, এই চিঠিখানায় সই করে দিন। হ্যাঁ, কোম্পানি আপনাকে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়েছে।

খাজাঞ্চি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ম্যানেজার তাহার হাতে কলম তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এইখানটায় সই ক'রে দিন। হ্যাঁ, তারিখ দিন—তারিখ।

চার্জও দেওয়া হইয়া গেল। খাজাঞ্চি দেখাইয়া দিল, তিন হাজার বাইশ টাকা, একটি আধুলি, একটি দু-আনি, কাগজে মোড়া একটি পাই।

ম্যানেজার তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া বলিলেন, দুঃখ করবেন না খাজাঞ্চিবাবু। ধরুন বয়সও অনেক হ'ল আপনার। আপনার যে রকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।

খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—

কর্মচারীরা কিন্তু এত সহজে বিদায় দিল না। তাহারা সভা করিল, বিদায়-ভোজ দিল, গলায় মালা পরাইয়া দিল, অনেকের চোখে জলও দেখা দিল।

পরদিন ভোরে কয়টা খালাসী খাজাঞ্চিবাবুর মাল মাথায় করিয়া স্টেশনে চলিয়াছিল....পিছনে পিছনে খাজাঞ্চিবাবু, তাহার চোখে সেই নূতন চশমা। খাজাঞ্চি বলিল, কইরে, এখনও সিটি দিলে না আজ এরা ?

খালাসী বলিল, এখনও তো সময় হয়নি বাবু, এই গাড়ীটা যাবে, তবে তো !

খাজাঞ্চির মনে পড়িল, হাঁ, তাহাই তো বটে, সাড়ে ছয়টা তো এখনও বাজে নাই। সাড়ে ছয়টার ট্রেনেই তো সে যাইবে। খাজাঞ্চি একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কারখানার চিমনি হইতে গলগল করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, ভগবান আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হইল।

কিন্তু কোথায় আকাশ! চশমা-আবরিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখেও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদ্গীর্ণ ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।

২। 'খাজাঞ্চি' কাকে বলে?

৩। খাজাঞ্চিবাবু কোন্ কারখানার কর্মচারী?

৪। কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?

৫। কারখানার কাজ কখন শুরু হয়?

৬। খাজাঞ্চিবাবুর নাম কি?

৭। কোম্পানীতে কত দিন কাজ করেছেন খাজাঞ্চিবাবু?

৮। নবীনদের কাছে প্রবীণদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়—খাজাঞ্চিবাবুর গল্পে এই সত্য কতদূর সফলতা লাভ করেছে তা বল।

৯। গল্পের শেষের দিকে কি হল?

১০। লেখক সম্বন্ধে কি জান?



[**প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ** বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে একজন অদ্বিতীয় ছোট-গলপকার হিসাবে পরিচিত। এঁর রচিত 'সাগর থেকে ফেরা' একাডেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বৈচিত্র্যময় সাহিত্যে ভীষণ জ্ঞান ছিল তাঁর। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার। ছোটদের অসামান্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর দান ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখা বাংলার কিশোর সাহিত্যে এক স্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

২৪ পরগনা জেলার নারকেল বেড়ে গ্রাম। একজন ইংরেজ সেনাপতি দুটি কামান, একশো গোরা সৈন্য, তিনশো দেশীয় সিপাই নিয়ে এই গ্রামে পেঁছিলেন।

সূর্য তখন অস্তে গেছে। পাতলা অন্ধকার গ্রামখানাকে ঢেকে ফেলেছে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা চারদিকে।

সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল চারশো সৈন্যের পায়ের শব্দ। গ্রাম ব্যস্ত হয়ে উঠল। যারা বেরিয়ে এল তারা চমকে উঠল।

এ যে রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন! যুদ্ধই বটে।

তিতুমীর নারকেল বেড়ে গ্রামে বাঁশের এক কেল্লা তৈরী করে বসে আছেন।

শত্রুরা তাঁকে আক্রমণ করতে এলেই তিনি বাধা দেবেন। সঙ্গে তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুম।

গৃহস্থ চাষীর ছেলে তিতুমীর, তাঁর প্রকৃত নাম মীর মিজার আলি। জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতেন। জুলুম

কি যে সে জুলুম ? কৃষ্ণদেব রায় নামে এক জমিদার প্রত্যেক প্রজার দাড়ির ওপর আড়াইটাকা করে কর বসিয়েছিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও কম ছিল না।

তারা ইচ্ছে মতো কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত। অনিচ্ছুক কৃষকদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করত। এইসব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিতুমীর দাঁড়ালেন। হিন্দু মুসলমান কৃষক দলে দলে তিতুর পাশে এসে দাঁড়াল।

তিতুর শক্তি বাড়তে লাগলো।

জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ হল।

তিতুমীর নিজেকে শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করলেন।

ইংরাজরা অন্যায় ভাবে এ দেশের রাজা হয়ে বসেছে।

তিতু তাদের স্বীকার করতে রাজী নন। তিনি শাসনকর্তা হিসাবে স্থানীয় জমিদারদের কাছে খাজনা দাবি করলেন। আশে-পাশের কয়েকটি গ্রামের হিন্দু মুসলমান কৃষক তাঁকে স্বাধীন বাদশাহ বলে মেনে নিল।

ইংরেজ শাসকরা ভয় পেল। তাদের শাসনের মূলে তিতুমীর আঘাত হানছে যে। এই অবস্থা ইংরেজরা সহ্য করতে পারল না। তাই তারা তিতুমীরকে শাসন করতে নারকেল বেড়েতে সৈন্য পাঠাল।

এখানে তিতু তাঁর অনুচরদের নিয়ে অসংখ্য বাঁশ আর মাটি নিয়ে তৈরী করেছেন বাঁশের দুর্গ।

এই দুর্গে কয়েকটি কক্ষ। কোনো কক্ষে খাদ্য, কোথাও অস্ত্র। অস্ত্র বলতে তরবারী, বর্শা, সড়কি, লাঠি থেকে আরম্ভ করে কাঁচা বেল ইট ইত্যাদি।

ইংরেজ সৈন্যের গ্রামে প্রবেশের কথা তিতুমীর এর মধ্যে জেনে নিলেন।

ইংরেজ সেনাপতি সেখানে উপস্থিত হলে তিতু আক্রমণ করলেন। রাতের অন্ধকারে আক্রান্ত হয়ে, ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে লাগলো।

পরদিন ভোরবেলা ইংরেজ সেনাপতি আবার দুর্গের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তিতু ও তার লোকজনকে সতর্ক করে বললে—আত্মসমর্পণ করো। না হলে কেল্লা কামানের মুখে উড়িয়ে দেব।

বীরের মত জবাব দিলেন তিতুমীর। তোমরা অন্যায় ভাবে এ দেশের রাজা হয়েছ। তোমাদের মানি না।

ক্রুদ্ধ সেনাপতি দুর্গ আক্রমণের হুকুম দিলেন। সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে ফেললো। তিতুমীরও প্রস্তুত। ইংরেজ সৈন্য কেল্লার কাছাকাছি আসতেই তিতুর লোকজন ইট, বেল, তীর, ছুঁড়তে শুরু করল। কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য প্রাণ হারাল। প্রমাদ গুনলেন ইংরেজ সেনাপতি। তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজ সেনাপতির হুঙ্কারে ভীত হয়ে তিতুমীর আত্মসমর্পণ করবেন।

কিন্তু তিতুমীর বীর। সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে তিতুমীর প্রস্তুত। ইংরেজ সেনাপতি কামানের গোলার নির্দেশ দিলেন। কামানের গোলার মুখে তিতু এবং তাঁর লোকজন বীরবিক্রমে লড়াই চালাতে লাগলেন। কিন্তু গোলার আঘাতে তিতুমীর বীরের মত মৃত্যুবরণ করলেন।

তিতুর সেনাপতি গোলাম মাসুম ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিতে তাঁর জীবন দান করলেন।

তিতুমীর ছিলেন বীর, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ গড়েছিলেন। সেই পথই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। তিতুমীরের প্রকৃত নাম কি ?
২। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় কি ভাবে গরীব কৃষকদের উপর জুলুম করত ?
৩। বাঁশের দুর্গ কি দিয়ে তৈরী ?
৪। এই দুর্গে কি কি ছিল ?
৫। তিতুমীর ও তার সৈন্যবাহিনীর বীরত্বের কথা বল।
৬। কার ফাঁসি হল ?
৭। তিতুমীর কি ভাবে জীবন দিলেন ?
৮। তিতুমীর দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁর দেশপ্রেম সম্বন্ধে কি জান ?
৯। তাঁর প্রধান সহকারীর নাম কি ?

দুঃখে যে ভেঙে পড়েনি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



[নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরে নানা পত্রিকায় সম্পাদকীয় কাজে নিযুক্ত হন। সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'গল্প ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। অনুবাদ ও জীবনীমূলক সাহিত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় যাদুকর। এঁর রচিত 'মা' উপন্যাসখানি অনুবাদ সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'দেশবন্ধু'র জীবনীগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থগুলি অমর হয়ে আছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এক সময়ে ইনি 'আকাশবাণীর গল্পদাদু'র আসরের পরিচালক ছিলেন।]

কলকাতার হরিতকী বাগানে বিশ্বনাথ তর্কভূষণ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ভূদেব বলে তাঁর এক ছেলে ছিল।

অসামান্য মেধাবী ছেলে। স্কুলে প্রতি বছরই সে প্রথম হত। প্রাইজ পেত।

ভূদেব কৃতিত্বের সঙ্গেই স্কুলের সব পরীক্ষায় পাস করল। এবার কলেজে পড়ার পালা। বিশ্বনাথের বড় সাধ ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াবেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে তখন মাসিক বেতন লাগত পাঁচ টাকা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাসে মাসে পাঁচ টাকা পাবেন কোথায়?

অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর একজন লোক বিশ্বনাথকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করতে সম্মত হলেন। বিশ্বনাথ ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ভদ্রলোকটি সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। এদিকে কলেজে ভূদেবেরও মাইনে বাকী পড়তে লাগলো। এভাবে বাকী পড়ে গেল ষোল মাসের মাইনে।

কলেজের সাহেব অধ্যাপকরা ভূদেবকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন, তার কারণ, তার মত মেধাবী ছেলে খুব কমই দেখা যেত। সেজন্য ষোল মাস বাকী মাইনেতেও ভূদেব পড়তে পেয়েছিল। কিন্তু আর বেশি দিন চলল না। একদিন কলেজের অধ্যক্ষ ভূদেবকে ডেকে জানালেন যে সমস্ত টাকা শোধ করে না দিলে কলেজ থেকে তার নাম কাটা যাবে।

বালকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আশী টাকা কোথা থেকে সে পাবে? অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে একবার পরীক্ষা দিতে পারলেই সে চল্লিশ টাকা বৃত্তি আদায় করতে পারবে।

নির্জনে আপনার মনে বিমর্ষ হয়ে ছেলেটি সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ দেখে, তার পিছনে একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় দুটো চোখে তার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে আছে। ছেলেটি ভূদেবের সহপাঠী। বড়লোকের ছেলে। নাম মধুসূদন দত্ত।

সমস্ত ছেলের মধ্যে মধুসূদন ভূদেবকেই শ্রদ্ধা করত, মনে মনে ভালবাসত। তারা দু'জনকে দু'জন যেন সেই সময়েই চিনে নিয়েছিল।

মধুসূদন ভূদেবের পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, ভাই একলা বসে কি ভাবছিস?

ভূদেব তার মাইনে না দিতে পারার ব্যাপার সমস্তই খুলে বলল।

ভূদেবের হাত দুটি ধরে মধুসূদন বলল, ভাই, যদি কিছু মনে না করিস, এ টাকাটা আমার কাছ থেকে তোকে নিতে হবে। আমি বাড়ি থেকে তোর জন্যে চেয়ে নিয়ে আসব।

সহপাঠীর কাছ থেকে হাত পেতে সেই দান গ্রহণ করতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের মন উঠল না। সে বলল, না ভাই, তাতে কাজ নেই। আমি নিজের চেষ্টায় এই টাকা সংগ্রহ করব।

এই মনস্থ করে বালক অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তার অন্তরের বাসনা জানাল। তারপর শুধু এইটুকু দয়া প্রার্থনা করল যে, পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত যেন তার নাম কাটা না হয়।

তাই হল। ভূদেব পরীক্ষা দিল। বৃত্তি পেয়ে কলেজের মাইনে পরিশোধ করতে তার কোন অসুবিধা হল না।

এইভাবে কোন রকমে কলেজের পড়া সাঙ্গ হল। কলেজের পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্তি ফুরিয়ে গেল।

কিছুকাল পরেই নানা অভাব অভিযোগ দেখা দিল। সংসার চলে না।

ভূদেব এখন বড় হয়েছেন। চাকরির সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেকে কেউ-ই সুপারিশ করে না।

কেরাণীগিরির জন্য ভূদেব কলকাতার অফিসে অফিসে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

যেখানেই যান, অফিসের কর্তা জিজ্ঞাসা করেন, সওদাগরী খাতা-পত্র রাখতে পার?

ভূদেব ম্লান মুখে বলেন, আজ্ঞে না, সবে মাত্র সিনিয়ার স্কলার পাস করেছি।

তখনই উত্তর আসে, স্কলার নিয়ে আমরা কি করবো বাপু! তুমি অন্যত্র দেখো।

এমনি ভাবে গ্রহের ফেরে, মাসের পর মাস চলে যায়। ভূদেবের কোনও চাকরি জোটে না। যে সে ছেলে নয়, হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে ভূদেব, সিনিয়ার স্কলার ভূদেব, তারও কোন চাকরি সেদিন জোটেনি।

এমনি ধারা অফিসের দরজা থেকে ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে শোনেন, তাঁর মা আর বাবাতে কথা হচ্ছে। বাবা বলছেন, কি কুক্ষণেই না ছেলেকে ইংরেজী পড়াতে গিয়েছিলেন। এক মুঠো চাল নেই ঘরে—আর ছেলে আমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কথাগুলো শেলের মত ভূদেবের বুকে গিয়ে লাগল। সত্যিই সে কি অপদার্থ! নিজের বাবা মাকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না।

বাড়িতে আর ঢুকলেন না। সোজা পথ ধরে আপনার মনে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা একেবারে ভুলে গেলেন। মনে রাখলেও কোন সুবিধা হত না। কাছে একটিও পয়সা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে চুঁচুড়ায় এসে পৌঁছলেন।

ভোর হল! গঙ্গার ঘাটে বসে রইলেন সারাদিন। মনে মনে ভাবলেন তিনি আর সংসারে ফিরবেন না। সেই গঙ্গা জলেই ডুবে মরবেন।

এই স্থির করে তিনি গঙ্গায় নামলেন। কিন্তু ডোবা হল না। গঙ্গার শীতল জলের স্পর্শে তাঁর মনের অবসাদ হঠাৎ কেটে গেল। জল থেকে উঠে পড়লেন। রোদের মধ্যেই আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষিদেয় সমস্ত দেহ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু অন্ন সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নেই। এই ভাবে বিকেলও কেটে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত হয়ে এক বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে পরনের কাপড় অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ সেই সময় একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে ভূদেবের সেই মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাপু?

ভূদেব মনের লজ্জা ত্যাগ করে বললেন, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি কিছু খাইনি।

বৃদ্ধ ভূদেবকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্ন করে নিজে তাঁকে খাওয়াতে বসালেন। বড় লোকের বাড়ি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও প্রচুর।

সেই নানারকমের বিচিত্র খাদ্য দেখে হঠাৎ ভূদেব কেঁদে ফেললেন। বাড়িতে তাঁর মা-বাবা আধ-পেটা খেয়ে রয়েছেন, তিনি কিভাবে এই খাদ্য মুখে তুলবেন?

ভূদেব বৃদ্ধকে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। তবে বৃদ্ধের অনুরোধে তাঁকে কিছু খেতেই হল।

ভূদেবের ব্যবহারে বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে বৃদ্ধ সেইদিনই ভূদেবকে তাঁর বাড়ির ছেলেদের জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

এই ভাবে চাকরি-জীবন শুরু হল ভূদেবের। নিজের যোগ্যতায় পরে ভাল চাকরি পেলেন।

এই ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন চাকরি থেকে পেনসন গ্রহণ করেন সেই সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে

বড় প্রথম বাঙালী কর্মচারী। তাঁর বেতন ছিল পনেরো শ' টাকা। শেষ জীবনে দেশবাসীর সৎশিক্ষা ও সুচিকিৎসার জন্য তিনি এক লাখ ষাট হাজার টাকা দান করে যান। তিনি আমাদের সকলের প্রণম্য।

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। এ গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
৩। ভূদেবের সাংসারিক অবস্থা কিরকম ছিল ?
৪। ভূদেব গঙ্গার ধারে মরতে গিয়েছিলেন কেন ?
৫। তিনি শেষ জীবনে কি ধরনের চাকরিতে বহাল ছিলেন ?
৬। তিনি শেষ জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করেন ?
৭। ভূদেব বৃদ্ধকে কি বলেছিলেন ?
৮। বিচিত্র খাদ্য দেখে ভূদেব কেঁদে ফেললেন কেন ?
৯। তিনি দেশের জন্য কি দান করে গেছেন ?
১০। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কি জান ?

বড় হওয়ার দায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাকালে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'অতসী মামী' নামক গল্প বেরুবার সময় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ঔপন্যাসিক জগতে ইনি এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এঁর রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।]

ছেলেবেলার আরেকটা গল্প বলি। শৈশবকালে নয়, কিশোর বয়সের। বাবা তখন টাঙ্গাইলে[১], ময়মনসিং জেলার একটা মহকুমা শহরে।....

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবারে বর্ষার পর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় ক'দিন স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঘুরে বেড়ানো বন্ধ, কানে একটানা চলেছে কুইনিনের ভোঁ ভোঁ! কী করা যায়? কালীপুজা আসছে, বাজীই বানানো যাক।

একটা মোটা বেঁটে শিশিতে বারুদ রেখে বারান্দায় উবু হয়ে বসে পটকা বানাবার জন্য ব্যবস্থাগুলি সারছি। কাছে ঘেঁষে বসে আছে ছোটো দুটি ভাই।

আমি এদিকে একমনে ন্যাকড়ার ফালি, পাথরের কুঁচি ঠিক করছি; ওদিকে লালু[২] করেছে কি, শিশি থেকে একটু বারুদ শিশিটার কাছেই ঢেলে ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখতে গেছে জ্বলে কি না!

---

১. বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের একটি জেলা এবং শহর।
২. লেখকের ছোট ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে শিশিটার বিস্ফোরণ এবং ছরাগুলির মতই টুকরো টুকরো কাচের অংশ আমাদের তিন ভাইয়ের অঙ্গে প্রবেশ। রক্তে বারান্দা ভেসে যাওয়া।

ঠিক সেই সময়ে বাবা কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তা থেকেই শিশি ফাটার শব্দ আর বাড়ির লোকের চিৎকার শুনে 'আমার সর্বনাশ হলো রে', বলতে বলতে ভিতরে এলেন এবং একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমাদের রক্তপাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন।

প্রত্যেকের শরীরে আট দশটা করে গভীর ফুটো হয়েছে, সহজে কি রক্ত বন্ধ হয়! অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আমরা খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে বেশী কাবু হয়েছিল ছোট ভাইটি।

তিন ভাই কি জন্য সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম জানো? উবু হয়ে বসার জন্য। ওভাবে বসায় পেট আর বুক ছিল পায়ের আড়ালে, হাত আর পায়েই তাই কাচ ঢুকেছিল বেশী।

তারপর ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনজনে বিছানা নিলাম পরদিন কাচ বার করার পালা।

সরু ফুটো করে কাচ শরীরে ঢুকেছে। শলা ঢুকিয়ে আগে ঠিক হবে কাচের টুকরোর অবস্থান, তারপর মাংস কেটে মুখ বড়ো করে বার করতে হবে।

ডাক্তারবাবু আমায় বললেন, 'তুমি বড়ো, প্রথমে তোমায় ধরবো। একটা কথা মনে রাখতে হবে! তুমি বারুদ বানিয়েছ, বোকার মতো কাচের শিশিতে বারুদ রেখেছ। তোমার জন্যে ছোট ভাই দুটির এত কষ্ট। কাচ বার করার সময় তুমি যদি বেশী চেঁচামেচি কাঁদাকাটা করো, ওরা দুজন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। কথাটা না বুঝে উপায় কি। অগত্যা দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজলাম। ক্ষতের মধ্যে শলা ঢুকিয়ে ডাক্তার যখন আস্তে আস্তে ভিতরে নেড়ে কাচ কোথায় আছে খোঁজেন, কাচ বার করার জন্য ছুরি কাঁচি চালান, তখন একটু চেঁচাবার অধিকার না থাকা যে কি ব্যাপার, সেদিন খুব ভাল করেই টের পেয়েছিলাম।

টুকরো অবশ্য বার করা গিয়েছিল সহজেই; তবু সময় লেগে–

ছিল অনেকক্ষণ। শেষ ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন, 'এ তো আশ্চর্য ছেলে একটু শব্দ করলো না।'

ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজন বোঝেননি ব্যাপারটা, তাই তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বীরত্ব বা অসাধারণ সহ্যশক্তির কোনো পরিচয়ই আমি সেদিন দিইনি। আমি চোখ বুজেছিলাম কেন জানো? আহত রক্তমাখা ভাই দুটির চেহারা, যন্ত্রণায় বিকৃত-কাতর তাদের মুখ মনের চোখের সামনে রাখার জন্য। আমি কেন, দুই ভাই ভয় পাবে ভড়কে যাবে জেনে ওই অবস্থায় কেউ চেঁচাতে পারে না।

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের কথায় বল।

২। 'বড় হওয়ার দায়' এ কথার অর্থ কি?

৩। টাঙ্গাইল কোথায়? কোন্ জেলায় অবস্থিত?

৪। লেখক যখন এক মনে ন্যাকড়ার থলি, পাথরের কুচি ঠিক করছিলেন তখন তার ভাই (লালু) কি করছিল?

৫। ডাক্তারবাবু লেখককে কি বলেছিলেন?

৬। 'একি আশ্চর্য ছেলে একটু শব্দ করে না'—এ কথা কে কাকে বলেছিলেন?

৭। তিন ভাই কি ভাবে আহত হয়েছিল?

৮। গল্পের মূল বক্তব্য কি?

৯। লেখক সম্বন্ধে তোমার কি মত?

১০। এ গল্পের করুণ কাহিনী কি?



[**আশাপূর্ণা দেবী ঃ** ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাশিল্পীদের মধ্যে ইনি খুবই বিখ্যাত। এঁর রচিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'অগ্নি পরীক্ষা', 'সুবর্ণলতা', বিখ্যাত উপন্যাস। ছোটদের জন্য অনেক গ্রন্থ আছে। ইনি নানা পুরস্কার পেয়েছেন, তার মধ্যে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অন্যতম। একাডেমী, রবীন্দ্র পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার ও শিশু সাহিত্যের পুরস্কারও পেয়েছেন। বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে এর সামাজিক পটভূমিকায় উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।]

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলেন নিরুপমা। নিরুপমার দরজার কড়া নড়ল ?

এ আবার কোন বিস্মৃত যুগের অনুভূতি। না, বোধ হয় শোনবার ভুল। নিরুপমার দরজার কড়া আর নড়ে না। কে আসবে ? কে আছে নিরুপমার ? সম্পর্কের সূত্র ধরে টানলে, হয়তো আছে অনেকেই, কিন্তু নিরুপমার দরজায় এসে কড়া নেড়ে ডাক দেবে এমন কেউ নেই জগতে। যা আসে সবই পাড়ার লোক। খুব বেশি না হলেও বাঁড়ুজ্যে গিন্নী আসেন মাঝে মাঝে, কালী-তলায় যাবার পথে পড়ে বলে যোগিনী ঠাকুরঝি আসেন সময় সময়। আর আসে সুবালা গয়লানী আর তার ছেলে শম্ভু। ওদের সঙ্গে নিতান্তই একটা প্রয়োজনের সূত্রে যোগ রাখতে হয়।

ভোরের অন্ধকারে চুপি চুপি সুবালার গোয়ালে গিয়ে রাশীকৃত গোবরের সদ্‌গতি করে দিয়ে আসেন নিরুপমা। অনেক গরু সুবালার, মস্ত ব্যবসা, হাতে বাত বলে ঘুঁটে ঠুকতে পারে না।

নিরুপমার সঙ্গে তাই এই ব্যবস্থা। ঘুঁটে বিক্রির পয়সা অর্ধেক সুবালার, অর্ধেক নিরুপমার। পয়সাটা দিতে আসে শম্ভু। সুবালাও আসে সেই পয়সায় চালটা নুনটা কিনে দিয়ে যেতে।

পাড়ার সকলেই জানে এ কথা, তবু এই গোপন দুঃখের কথা তুলে কেউ আলোচনা করে না। তাদের এই মহত্বটুকুর জন্যে ভারি কৃতজ্ঞ নিরুপমা। অবিশ্যি, বাগানের কলাটা মুলোটা দিয়ে সাহায্য তারাও করে, নইলে কি আর এতদিন নিজের ভিটেয় থেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারতেন।

কিন্তু সে-কথা থাক, তারা কেউ কড়া নেড়ে আসে না। উঠোনের দিকের বেড়ার ঝাঁপ ঠেলে ঢোকার কৌশল সকলেরই জানা। এ যে বাইরের দরজা।........কড়াটা আবার নড়ে উঠল সজোরে। নাঃ, নিশ্চয় পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলের কাজ। হঠাৎ জেগে-ওঠা খেয়ালের খেলা। বিরক্তভাবেই উঠে এলেন নিরুপমা, বকবেন বলে। কিন্তু দরজা খুলতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, শুধু চির-অভ্যাসে মাথার কাপড়টা টানতে ডান হাতটা একটু উঠল।

দুটি কমবয়সী ছেলে।

সুবেশ সুকান্তি। সন্দেহ নেই যে কলকাতা থেকে এসেছে। বাড়ি ভুল করেনি তো।

—কাকে চাও বাবা?

একটি ছেলে তড়বড় করে বলে উঠল—এটা কবি অনন্ত বাগচীর বাড়ি তো? আমরা তাঁর মাকে চাই।

দরজা খুলে দিশেহারার মত তাকিয়ে ছিলেন নিরুপমা, কথাটা শুনে যেন আচমকা হোঁচট খেলেন। অনন্ত বাগচী। হঠাৎ শ্মশানের চিতাভস্ম অন্বেষণ করবার বাসনা কেন এদের?

—এটাই স্বর্গত কবি অনন্ত বাগচীর বাড়ি তো? সপ্রতিভ ছেলেটি আবার প্রশ্ন করে।

নিরুপমা ঘাড় কাত করলেন।

—আচ্ছা—ইয়ে—আপনিই কি তাঁর—

—হ্যাঁ আমিই তার মা। কি বলবে বল।

এবারে পিছনের ছেলেটি ইতি-উতি তাকিয়ে বলে, আমরা এক টা দরকারী কথা বলতে এসেছিলাম—

কথা বলতে গিয়ে মাঝখানে যেভাবে থেমে যায় তাতে বুঝতে

দেরি হয় না এরা একটু বসতে চায়। নিরুপমা বুঝতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে আবার কি দরকার থাকতে পারে! তবু বললেন—আচ্ছা, এস তাহলে এই ঘরে। একখানিই ঘর, দ্বিতীয় ঘরখানা ও-বছরের বর্ষায় পড়ে গেছে। দুটো ঘরের জিনিস একটা ঘরে বোঝাই করা, তারই একপাশে সরু তক্তাপোশটা, যার মাথার দিকে নিরুপমার অকিঞ্চিৎকর বিছানাটা গোটানো।

তক্তাপোশেরই একপাশে বসল ছেলে দুটো। তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। ভাল জিনিস কিছু নেই, তবু জিনিসে ঠাসা ঘর। একটা পুরনো সংসারের বংশানুক্রমিক সঞ্চয় পায়াভাঙ্গা সিন্দুক, কব্জাভাঙ্গা ট্রাঙ্ক, চটা-ওঠা ক্যাশ বাক্স থেকে শুরু করে কি আছে আর কি নেই। বাক্স সিন্দুক ছাড়াও আছে ছিঁড়ে যাওয়া লেপ তোশকের তুলো, গায়ে দেবার মত বড় কাঁথা, নিরুপমার কাছে অর্থহীন মোটা মোটা তাকিয়া আর বালিশ কটা, ইঁদুরে কাটা কম্বল, রঙজ্বলা শতরঞ্চ, আছে মরচে-ধরা লোহার বাসনের গোছা, বঁটি কাটারি হামানদিস্তে, আছে ঝুড়ি চুপড়ি কুলো ডালা বারকোস, আছে শিশি বোতল, কড়ির বোয়েম, কাঁচের জার, সম্পূর্ণ একটা সংসারে যে জিনিসগুলো সর্বদা প্রয়োজনীয় ছিল। নিরুপমার আর কোন কিছুতেই প্রয়োজন নেই। একটা পিতলের সরা আর ঘটি, একখানা কানাভাঙ্গা পাথর, শুধু এই, এইতেই চলে যায় তাঁর। হ্যারিকেন দুটো তাও তোলা আছে জানলার মাথায় তক্তায়। একটা ঢিবরি জ্বালবার কেরোসিন, তাও থাকে না সর্বদিন, অন্ধকারে হাতড়ে কাজ চালিয়ে নেন।

ছেলে দুটি খুব নিরীক্ষণ করে চারিদিক দেখছিল, নিরুপমা একটু অপেক্ষা করে বললেন—কই বাবা, কি বলবে বলছিলে?

—ও হ্যাঁ—কুণ্ঠিত হাস্যে একজন বলে—হ্যাঁ, বলছি। আচ্ছা —ইয়ে উনি কোন্ ঘরে বসে লিখতেন?

নিরুপমা কেমন থতমত খেয়ে বলে ফেলেন—কে লিখত?

—আপনার ছে—মানে কবি অনন্ত বাগচীর কথা বলছি—

নিরুপমা বোধহয় শুধু 'লেখা' কথাটার অর্থ গ্রহণ করতে পারলেন না। ম্লানভাবে বললেন—এই ঘরেই লেখাপড়া করেছে বরাবর।

অপর ছেলেটি এইবার নড়েচড়ে সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে—আচ্ছা অশোক, কাজের কথাটা হয়ে যাক। আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন—

—হ্যাঁ, বলছিলাম কি—আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—

অতঃপর নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তারা।

শুনে প্রথমটা মানেই বুঝতে পারেন না নিরুপমা, বোঝা সম্ভব নয়। নিরুপমা যে জগতে বাস করেন, সেখানে এমন হাওয়া পৌঁছায় না যে নিরুপমা ওয়াকিবহাল থাকবেন, বাঙলাদেশ আজ কতখানি গুণীর সমঝদার হয়ে উঠেছে।

নিরুপমা জানেন না বাঙলাদেশ এখন সারাবছর ধরে শুধু জয়ন্তী-সভা আর স্মৃতি-সভা নিয়েই আছে। হাতের কাছে গুণী খুঁজে না পেলে কবর খুঁড়েও টেনে বার করছে। 'জয়ন্তী' শব্দটাই নিরুপমা জীবনে শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

কবি অনন্ত বাগচীর জন্ম-জয়ন্তী করতে চায় ওরা! করতে চায় কবির জন্মভিটায়।

'মৃত্যুর পর জন্ম হয়'—এ সত্য অবশ্য নিরুপমার জানা, কিন্তু মৃত্যুর পর জন্মতিথি উৎসব হয়, এ কথা আজই প্রথম শুনলেন। অনেক বিস্ময় আর অনেক প্রশ্নোত্তরের পর যখন ওদের ইচ্ছেটা নিরুপমার মস্তিষ্কের কোটরে পৌঁছল তখন নিষ্প্রভ ভাবে বললেন—কিন্তু এটা তো তার জন্মমাস নয়।

—তাতে কি?........ছেলেটি সোৎসাহে বলে, বছরের কোন এক সময় তো জন্মেছিলেন? বেঁচে থাকলে কত বয়েস হত সেইটা শুধু বলে দিন, সব ঠিক করে নেব।

নিরুপমা যেন আর কথা কইতে পারছিলেন না, তাদের কথাগুলো ঝাপ্সা ঝাপ্সা ভাবে মাথার মধ্যেই আসছে যাচ্ছে........নিজে কি বলছেন নিজেরই মাথায় ঢুকছে না, তবু ক্লিষ্ট স্বরকে যতটা সম্ভব সহজ করে বলেন—চব্বিশে পড়েই চলে গেল, আর গিয়েছে এই এগার বছর—

তা হলে—পঁয়ত্রিশ? আচ্ছা ঠিক আছে! সামনের রবিবারে সব ব্যবস্থা করছি। আমরাই সব করে নেব। ফুলটুল যা কিছু কলকাতা থেকে সব আনা হবে, আপনি শুধু এই ঘরটা খালি করে রেখে দেবেন।

ঘরটা খালি করে দেবেন।

এ আবার কি এক নতুন ধাক্কা! এই ঘরটাকে খালি করবার উপায় আছে নাকি?

নিরুপমা করুণ ভাবে বললেন—কিন্তু বাড়িতে তো আর জায়গা নেই বাবা—কোথায় সরাব ? আর একটা ঘর ভেঙে পড়ে আছে—

ছেলেটি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে ব্যস্ত ভাবে বলে—যা হ'ক করে দেবেন, একদিনের জন্যে বৈ তো নয় ? রাত্রে আবার সব ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঘরের জিনিসগুলো তাদের চোখে এমনই মূল্যহীন যে এগুলো সরান নিয়ে কেউ ভাবনায় পড়তে পারে এমন খেয়ালই হয় না তাদের। আঠার-উনিশের ছেলে, যে কাজে মেতেছে সেই কাজের সুবিধে ছাড়া আর কিছুই তাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না।

নিরুপমার কাছে সব ঠিক করে দেওয়া যে কি, সে ধারণাই কি আছে ওদের ?

ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে, ওরা এবার উঠল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আচ্ছা, তাহলে এই কথাই রইল ? এই অশোক কিংবা আমি একজন কেউ সকালের ট্রেনে এসে সব সাজিয়ে টাজিয়ে ফেলব। বিকেলের ট্রেনে বাকি সবাই এসে পড়বেন।........ সভাপতি হচ্ছেন কবি মৃণালকুসুম, প্রধান অতিথি হবেন নীহার চাকলাদার এম. এল. এ. মানে উনিই সব খরচপত্র করবেন কিনা! আরও কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ইত্যাদি আসবেন, রীতিমত ভাল করেই এটা করব ঠিক করেছি আমরা। ....আচ্ছা আশোক, আজ তাহলে ওঠা যাক, ট্রেন ছেড়ে দেবে শেষটা........কার্ডটা তা হলে এইভাবে ছাপান হ'ক—

"স্বর্গত কবি অনন্ত বাগচীর পঁয়ত্রিশতম জন্মবার্ষিকী" কি বলিস্ ? দূর "বার্ষিকী" কথাটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, জয়ন্তী হ'ক না।

কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায় ওরা। একটা কথা শুধু কানে আসে নিরুপমার...."দু' একটি রঙিন শাড়ি-টাড়ি যোগাড় করে আনতে হবে দেয়ালগুলো চাপা দিতে, যা দেয়ালের অবস্থা।"

দেয়ালের মত নিথর হয়েই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন নিরুপমা খোলা দরজার সামনে।........তারপর সহসা সমস্ত চিন্তার মাঝখানে বিদ্যুৎশিখার মত মনে পড়ে গেল, উনুনে কি যেন চড়িয়ে এসেছিলেন।........ও হ্যাঁ, চারটি মুলোর শাক সিদ্ধ করতে চাপিয়েছিলেন। আজকের আহারের উপকরণ। এইবার ত্বরিত পায়ে রান্নার দিকে চলে গেলেন নিরুপমা।........কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল

আগুনে বসান থাকলে শাকগুলো অবিকল ঠিক থাকবে এমন আশা করা যায় না। শাক তো আর মানুষ নয়!

হ্যাঁ, পিতলের সেই সরাখানা মেজে সাফ করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল নিরুপমার। রান্না? সেদিন আর মোটেই মন লাগল না। ..... সারাদিন ধরে, খালি মনে বাজতে লাগল, রবিবার, রবিবার। ...আজকের বারটা কি? শম্ভু এলে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।—ঠিক মনে নেই বুধবার না বেস্পতিবার।

একাদশীটা কবে পড়বে এইটুকু জেনে নেওয়া ছাড়া, বার-তারিখে আর কি দরকারই বা পড়ে?

নিরুপমার বুকের মধ্যে অনেক ঢেঁকির পাড় পড়িয়ে তিনটি অনিদ্র রাত পার করিয়ে রবিবার এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল দুটি ছেলেই। উৎসাহের চোটে কেউই থাকতে পারল না বোধ হয়।

শম্ভুকে দিয়ে অনেক জিনিসই বার করিয়েছিলেন নিরুপমা, কতক রান্নার চালার নিচে, কতক ভাঙা ঘরের কাঠামোটার আড়ালে, কিছু বা উঠোনে। তবু কিছু ছিল। মানুষ তো বিধাতা পুরুষের মত চটপটে নয় যে এক সেকেণ্ডে ঘর খালি করে দিতে পারবে? মানুষের অনেক দেরি লাগে। সকালেও কিছু কিছু টানাটানি করছিলেন নিরুপমা, ওরা এসে হাত লাগাল। ব্যাস্, তারপরে যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সারাটা দিন কোন ফাঁকে কেটে গেল। হঠাৎ এক সময় দেখলেন নিরুপমার চির অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটা আলোয় ভাসছে।

[সংক্ষিপ্ত]

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত?
৩। নিরুপমা কে ছিলেন?
৪। কি ভাবে তাঁর দিন কাটতো?
৫। অনন্ত বাগচী কে ছিলেন?
৬। তিনি কি করতেন?
৭। অনন্ত বাগচীর জন্য যে দুটি যুবক এসেছিল তারা কি করতে চেয়েছিল?
৮। যুবক দুটির নাম কি কি?
৯। জন্মজয়ন্তী কাকে বলে?
১০। এই গল্পের মূল ভাবটি কি?

দাওয়াই



[**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ** ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত ছোটগল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এঁর রচিত উপনিবেশ, স্বর্ণসীতা, পদসঞ্চার, লালমাটি…প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় উপন্যাস। টেনিদা এঁর আশ্চর্য সৃষ্টি। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।]

কেষ্টগোপালবাবুকে লোকে বলে কাষ্ঠগোপাল।

অকারণে বলে না। একটা মিষ্টি কথা বলার অভ্যেস নেই ভদ্রলোকের। কারণে অকারণে লোককে যা-তা বলে তাদের মন খারাপ করে দিতে তিনি ভয়ানক ভালবাসেন।

এই ধরো পটলা অঙ্কে ফেল করে ক্লাশে প্রমোশন পেলো না, তিনদিন ধরে ছেলেটা খালি কেঁদেছে তাকে দেখে সকলেরই দুঃখ হয়, কেবল কাষ্ঠগোপালের হয় না। পটলাকে আরও কষ্ট দিয়ে মনে মনে তিনি ভারী আরাম পান। বাজারের ভেতর দিয়ে হয়তো পটলা যাচ্ছে, চারিদিকে লোকজন, তার মধ্যে গলা চড়িয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, কিরে পটলা, অঙ্কে নাকি তুই তিন পেয়েছিস?

পটলা যে দৌড়ে পালাবে তারও জো নেই! রাস্তা জুড়ে কাষ্ঠ-গোপাল দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের সামনে ডুকরে কেঁদে উঠবার যো নেই পটলার।

লাভের মধ্যে যারা খবরটা জানতো না তারাও জেনে গেল। মিটমিট করে হাসতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল।

বিশ্বনিন্দুকে লোক।

কিছু পছন্দ হয় না কাষ্ঠগোপালের। পাড়ার কোনো বাড়ীতে বিয়েটিয়ে হলে ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

আর খেতে বসে কী করেন কাষ্ঠগোপাল ?—আরে ছ্যা, এর নাম লুচি ? এ যে জুতোর চামড়া হে। পচা ভেজিটেবল ঘি জোটালে কোথেকে ? রাম-রাম, এ রকম বাজে মাছের কালিয়া, তো কখনও খাইনি। অ্যাঁ—এগুলো রসগোল্লা নাকি ? তাহলে আর সুজির পিণ্ডি কাকে বলে !

কেউ যদি বলে, আমাদের তো ভালোই লাগছে—কাষ্ঠগোপাল তাকে ঠাট্টা করতে থাকেন। বলেন পরের পয়সায় যে খাচ্ছ হে। জুতোর সুখতলাও মনের মত মনে হবে, মার্বেল খেতে দিলেও বলবে জনাইয়ের মনোহরা খাচ্ছি।

এই হলেন কাষ্ঠগোপাল ! কিন্তু লোকে তাঁকে চটাতে সাহস পায় না। তাঁর অনেক টাকা, আর পাড়ার অর্ধেক বাড়ির তিনি মালিক।

পাড়ায় নতুন বাড়ি করে এসেছেন মার্তণ্ডবাবু। রাশভারী চেহারার লোক। কী যেন সরকারী চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন, বই-টই পড়েন আর সকালে-বিকালে একটা লাঠি হাতে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যান।

কাষ্ঠগোপাল গিয়ে হাজির হতেন তার কাছে। নতুন লোক আলাপ করা চাই। তা ছাড়া ফাঁক পেলে দুটো কড়া কথাও বলে আসবেন।

মার্তণ্ডবাবু একটা মস্ত চামড়া বাধানো ডেক-চেয়ারে বসে একটা ইংরিজি বই পড়ছিলেন। কাষ্ঠগোপালকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন আসুন। আসুন।

—আলাপ করতে এলুম।

চশমার ভেতর দিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখে নিলেন মার্তণ্ড। তারপর বললেন, বেশ।

একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, এ পাড়ায় বাড়ী করলেন কেন ?

—এমনি ! ভালো লাগল।

—না মশাই অতি নচ্ছার পাড়া। লোকগুলো খুব বাজে।

—তাই নাকি ? আপনিও বুঝি বাজে ?

কথাটা শুনে একটা বিষম খেলেন কাষ্ঠগোপাল; না—না—ইয়ে—আমি বাজে লোক নই। পাড়ায় একমাত্র ভালো লোক আমাকেই বলতে পারেন।

মার্তণ্ড বললেন—শুনে সুখী হলুম। তা কী খাবেন? চা? না ঘোলের সরবৎ। কাষ্ঠগোপাল বললেন, বড্ড গরম পড়েছে আজ। ঘোলের সরবৎই ভালো।

মার্তণ্ড ঘোলের সরবৎ আনতে বলে দিলেন চাকরকে। কাষ্ঠগোপাল ভাবতে লাগলেন, এইবার কী বলা যায়।

অনেক খরচ করে বাড়ী করলেন মশাই কিন্তু ভালো হয়নি।

মার্তণ্ড বললেন ভালো হয়নি বুঝি! সবাই তো প্রশংসা করছে বাড়ীর।

—ও তো মুখের প্রশংসা মশাই। এই আবার বাড়ীর একটা ডিজাইন নাকি? তাছাড়া সব বাজে বাজে মাল-মশলা দিয়ে তৈরী মশাই, দেখবেন—এক বছরেই ফাটল ধরে যাবে।

—ফাটল ধরে যাবে?

যাবেই তো। কনট্রাকটররা কী করে? যেমন তেমন করে কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দী। যা তা একটা তৈরী করে দিলেই হল।

—মার্তণ্ড আবার কাষ্ঠগোপালের দিকে তাকালেন। কিন্তু এ বাড়ী তো কনট্রাকটারে করেনি। আমার বড় ছেলে এনজিনীয়র, সেই-ই দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে।

—ও—ও কাষ্ঠগোপাল একটু ঘাবড়ালেন; তা হলে মাল-মশলা ভালোই আছে! কিন্তু আপনি যাই বলুন ডিজাইনটা ভাল হয়নি।

কপাল কুঁচকে মার্তণ্ড কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কাষ্ঠগোপালের দিকে। আর এর মধ্যে চাকর ঘোলের সরবৎ নিয়ে এল।

চমৎকার সরবৎ। মশলা-টশলা দিয়ে অনেক যত্ন করে তৈরী—নিন্দে করবার কিছু নেই; কিন্তু এক চুমুক খেয়েই নাক কুঁচকে উঠল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড বললেন—সরবৎ আপনার পছন্দ হয়নি বোধ হয়!

কাষ্ঠগোপাল বললেন—সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। না—পছন্দ হয়নি। মার্তণ্ড শান্ত গলায় বললেন, কি রকম আপনার পছন্দ?

—এই দই দোকান থেকে আনিয়েছেন তো ?

—আর কোথায় পাব ?

—তাই। আরে দোকানের দই কি আর দই মশাই, ও তো অর্ধেক চুনের গোলা। বিনীত হয়ে মার্তণ্ড বললেন—তাহলে ভাল দই কোথায় পাব বলতে পারেন ?

—বলছি, শুনুন।—খুশি হয়ে কাষ্ঠগোপাল টেবিলে একটা চড় মারলেন ; সে দই খেয়েছিলুম আমার পিসীমার বাড়ীতে—হরিপালে। মানে তারকেশ্বর লাইনে যে হরিপাল আছে সেখানে।

মার্তণ্ড বললেন—বলে যান।

—আগের দিন গরু দোয়ানো হল। সেই টাট্‌কা দুধ ক্ষীরের মতো জাল দিয়ে সন্ধ্যেয় দই পাতা হল। সেই দই থেকে পরদিন দুপুরে যখন ঘোল তৈরী হল—বাধা দিয়ে মার্তণ্ড বললেন, বুঝেছি। আমিই সে ঘোল খাওয়াতে পারি আপনাকে। একেবারে সেই জিনিস। একেবারে কোন খুঁত পাবেন না।

বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মার্তণ্ড। কাষ্ঠগোপালকে বললেন আসুন আমার সঙ্গে।

কাষ্ঠগোপাল চমকে গেলেন।

—কোথায় যেতে হবে ?

—আসুন বলছি।

বাপরে, কি গলার আওয়াজ মার্তণ্ডের। পিলে চমকে গেল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড আবার সেই বাঘস্বরে বললেন, আসুন শীগগির।

অগত্যা উঠে পড়লেন কাষ্ঠগোপাল। তাঁকে সোজা দোতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে দিলেন মার্তন্ড। বললেন ঢুকুন ওর মধ্যে।

—অ্যাঁ। ওখানে কী ?

—ঘোলের সরবৎ। আপনি যেমন চেয়েছেন। ঢুকুন।

প্রায় ঠেলেই কাষ্ঠগোপালকে ভেতরে ঢোকালেন মার্তণ্ড। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

বাজের মতো আওয়াজ তুলে মার্তণ্ড বললেন—আমার স্পেশ্যাল

সরবৎকে আপনি নিন্দা করলেন। ঠিক আছে, আপনি যা চান, তাই খাওয়াব।

—কিন্তু এ ঘরে সরবৎ কোথায় মশাই। মিস্তিরিদের কঠা চুনের টিন, কটা বাঁশ—

—আসবে, সরবৎ আসবে। আমি এখন হাটে লোক পাঠাচ্ছি; সন্ধ্যের মধ্যে সে লোক ফিরে আসবে। কাল দুধ দোয়ানো হলে—দই পাতা হবে। সেই দই থেকে পরশু দুপুরে ঘোল হবে। সেই ঘোল খেয়ে, তবে আপনি এ ঘর থেকে বেরুবেন, তার আগে নয়।

মার্তণ্ড চলে গেলেন। কাতরস্বরে চেঁচাতে লাগলেন কাষ্ঠগোপালবাবু, কেই সাড়া দিল না।

ভাগ্যিস, ঘরের ছোট জানলাটায় শিক-টিক কিছু ছিল না। প্রাণের দায়ে সেইটে দিয়ে ঝাঁপ মারলেন কাষ্ঠগোপাল—পড়লেন একটা পচা ডোবার ভেতর। ঘোলের বদলে একপেট কাদাজল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর সেই যে ছুটলেন—

অলিম্পিকের দৌড়ও তার কাছে লাগে না।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। 'দাওয়াই' নামকরণ হল কেন?
৩। কাষ্ঠগোপাল কে?
৪। মার্তণ্ড কে?
৫। গল্পটি পড়ে কি বুঝলে?
৬। মার্তণ্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে —কাকে বললেন?
৭। দই থেকে পরশুদিন দুপুরে কি হবে?
৮। কাষ্ঠগোপাল টেবিলে এক চড় মেরে কি বললেন?
৯। কাদাজল, ঘোলের সরবৎ, চুনের জল প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে?
১০। এই গল্পটি কি হাসির? তার প্রসঙ্গে আলোচনা কর।

শিশু সাহিত্যিক



সত্যজিৎ রায়

[**সত্যজিৎ রায়ঃ** ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতামহ বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এঁর পিতা বাংলা শিশু সাহিত্যের অদ্বিতীয় যাদুকর সুকুমার রায়। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে 'ফেলুদা' এঁর আশ্চর্য সৃষ্টি। এঁর রচিত সোনার কেল্লা, আরও আরও, একডজন গল্প, ফেলুদার গল্প, আমার ছেলেবেলা···প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র জগতে এর অবদান সারা পৃথিবীতে খ্যাতি-লাভ করেছে। 'পথের পাঁচালী' এঁর বিখ্যাত চিত্র। ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। শিল্পী, সাহিত্যিক, পরিচালক, সম্পাদক হিসাবে সত্যজিৎ রায় বর্তমানের একজন বিশিষ্ট জননায়ক হিসাবে পরিচিত।]

ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'বহুরূপী' এক বছর হল বেরোচ্ছে। সম্পাদক সুপ্রকাশ সেনগুপ্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন কাগজটাকে ভালো করতে। টাকার জোর নেই, তাই কাজটা সহজ নয়। গ্রাহক সংখ্যা দেড় হাজারের মতো, বিজ্ঞাপন যা আসে তার থেকেই টেনেটুনে চলে যায়। লাভ থাকে না মোটেই। তবে সুপ্রকাশ আদর্শবাদী, তাঁর বিশ্বাস কাগজটা দাঁড়িয়ে যাবে, এবং তার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন না তিনি।

সবচেয়ে মুশকিল হল গল্প নিয়ে। ভালো ছোটদের গল্প প্রায় আসে না বললেই চলে। এমনকি সুপ্রকাশ দু একবার নামী লেখকদের লেখাও জোগাড় করেছেন, কিন্তু সে লেখাও দায়সারা। নাম করা জনপ্রিয় পত্রিকার লেখাও সুপ্রকাশ পড়ে দেখেছেন, তারও

গল্পের মান তেমন উঁচু নয়। আসলে ভালো গল্প আর তেমন লেখাই হচ্ছে না এই হল সুপ্রকাশের ধারণা।

অথচ পাণ্ডুলিপির অভাব নেই। প্রতি মাসে ষাট-সত্তরটা করে লেখা ডাকে আসে—গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ। গল্পের উপরেই সুপ্রকাশ বেশি জোর দেন, কাজেই সেই পাণ্ডুলিপিগুলোই তিনি আগে পড়েন। দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ লেখাই বাতিল হয়ে যায়। নতুন লেখকের অনেক লেখা আসে, এবং সে লেখা পড়েই বোঝা যায় কাঁচা। মাঝে মাঝে সে লেখা পড়বারও দরকার হয় না। পাণ্ডুলিপির চেহারা দেখেই সুপ্রকাশ তাকে বাতিল করে দেন। শুধু পাণ্ডুলিপির চেহারা কেন, সময় সময় লেখকের নাম থেকেই বোঝা যায় সে লেখা পড়ে কোনো লাভ নেই। নদের চাঁদ ভড় বলে এক ভদ্রলোক তিন-চারখানা গল্প পাঠিয়েছেন, সঙ্গে ডাক টিকিট। সুপ্রকাশ সেগুলো না পড়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। নদের চাঁদ ভড় যার নাম সে লেখকের কাছ থেকে সুপ্রকাশ কিছু আশা করেন না। তাছাড়া পান্ডুলিপিও অপরিচ্ছন্ন। লেখা ফেরত পাঠাবার সময় সঙ্গে ছাপা চিঠি যায়—'আপনার অমুক রচনা মনোনীত না হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। নমস্কারান্তে ইতি'—ইত্যাদি।

তেমনি বটকেষ্ট হোড়, নকুড়চন্দ্র হাতি, গজানন আইচ—এদের সকলের লেখাই সুপ্রকাশ না পড়ে ফেরত দিয়েছেন। তার মন বলেছে লেখকের নামের সঙ্গে লেখার উৎকর্ষের একটা সামঞ্জস্য থাকে। উৎকট নামের ভালো লেখক আশা করা ভুল। এখনো পর্যন্ত গল্পের দিক দিয়ে কাগজটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন দুটি লেখক—অমিয়নাথ বসু আর সঞ্জয় সরকার। দুজনেই সুপ্রকাশের আবিষ্কার, দুজনেই নিয়মিত গল্প পাঠান, এবং দুজনেই ভালো লেখেন। গল্পের বিষয় এবং ভাষা দুইই ভালো। সুপ্রকাশের গরিব কাগজ, কিন্তু তাও এ দুজন লেখককে তিনি নিয়মিত পারিশ্রমিক দেন।

লেখা যে সব সময় ডাকে আসে তা নয়। মাঝে মাঝে লেখক নিজেই লেখা সমেত এসে উপস্থিত হন। হয়ত এঁদের ধারণা যে নিজে নিয়ে এলে লেখা মনোনীত হবার সম্ভাবনা বেশি। সুপ্রকাশ তাঁদের বলেন লেখা রেখে যেতে—মতামত যথাসময়ে জানানো হবে।

একদিন দুপুরের দিকে সুপ্রকাশ তাঁর ছোট্ট অফিসে বসে পাণ্ডুলিপি দেখছেন, এমন সময় একটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা রোগা ফরসা ভদ্রলোক একটা লেখার বাণ্ডিল বগলে নিয়ে তাঁর আপিসে

এলেন। সুপ্রকাশ মুখ তুলে চাইতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি একজন শিশু সাহিত্যিক; আমার নাম উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কয়েকটা গল্প এনেছি আপনার পত্রিকার জন্য! আপনি অন্ততঃ একটি যদি এখন পড়ে দেখেন।'

'এখনই ?' সুপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকাল ডাকের বড় গোলমাল হয়। তাই আমি নিজেই সঙ্গে করে লেখাগুলো নিয়ে এসেছি। তিনটে ছোট গল্প। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার পছন্দ হবে। আমি সেই প্রথম থেকে বহুরূপী দেখছি। কাগজটার উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি পত্রিকার গল্পগুলো তেমন যুৎসই হচ্ছে না। আমি থাকি সেই নাকতলায়। আপনি যদি অন্ততঃ একটা গল্প এখনই পড়ে আপনার মতামত দেন তাহলে বাধিত হব! আমি এই চেয়ারটায় বসছি; আমার তাড়া নেই।'

'সচরাচর আমি এ জিনিসটা করি না', বললেন সুপ্রকাশ।

'আমি জানি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ। গল্প ছোট; আপনার বেশি সময় লাগবে না।'

'বসুন।'

সুপ্রকাশ অগত্যা বাণ্ডিলটা ভদ্রলোকের হাত থেকে নিয়ে নিলেন। তিনটে গল্প, বেশ ঝরঝরে পাণ্ডুলিপি। সুপ্রকাশ একটা গল্প পড়তে শুরু করলেন।

দশ মিনিট লাগল গল্পটা পড়তে। খাসা লেখা। এত ভালো গল্প সুপ্রকাশের দপ্তরে কখনো আসেনি। সুপ্রকাশ নিজের আগ্রহেই বাকি দুটো গল্প পড়ে ফেললেন। এ দুটোও চমৎকার। ভদ্রলোকের ক্ষমতা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'ভালো গল্প,' বললেন সুপ্রকাশ। 'আমি তিনটে গল্পই নিচ্ছি। পর পর ছাপব। 'ভবঘুরে' গল্পটা সব থেকে ভালো, ওটা আমি পুজো সংখ্যার জন্য নির্বাচন করলাম। আপনাকে যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ। ইয়ে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।'

'বলুন।'

'আপনি কি সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়তেন ?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন ত ?'

'আমিও একই ইস্কুলে পড়েছি। আপনার চেয়ে এক ক্লাস নিচে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ— আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কারণ আমি অনেক রোগা হয়ে গেছি।'

'তা হবে। তাছাড়া প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা ত।'

'কিন্তু আপনি খুব বেশি বদলান নি। শুধু আপনার একটা জিনিস বদলেছে।'

'কী?'

'আপনার নাম। আপনাকে আমি নিধুদা বলে ডাকতাম। আপনার নাম ছিল নিধিরাম ধাড়া।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, সে নামে কি আর কাগজের সম্পাদক হওয়া যায়?' বললেন সুপ্রকাশ। 'তাই কাগজটা বার করার সময় নামটা বদলে নিই।'

উজ্জ্বল বাবু উঠে পড়লেন।

'আমি তাহলে আসি। আপনাকে গল্পগুলো পড়িয়ে সত্যিই আনন্দ পেলাম, নিধুদা। আপনাকে নিধুদা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক বাণ্ডিল নিয়ে এসেছিলেন, এখন খালি হাতেই বেরিয়ে গেলেন বহুরূপীর আপিস থেকে। আসল ব্যাপারটা উনি ধরে ফেলেছেন। বহুরূপীর সম্পাদক তাঁর লেখাগুলো না পড়েই ফেরত দিয়েছিলেন। এই একই গল্প, এবং তার জন্য তাঁর নামই দায়ী। নদের চাঁদ ভড়! গোড়া থেকেই নামটা বদলে নেওয়া উচিত ছিল, আর নিজে না লিখে তাঁর ভাগিনকে দিয়েই পাণ্ডুলিপি লেখানো উচিত ছিল!

যাক্, এখন থেকে তাঁর লেখা বহুরূপীতে ছাপা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল। ২। শিশু সাহিত্যিক কাকে বলে? গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত? ৩। বহুরূপী কি? সম্পাদক কে? ৪। সম্পাদকের পছন্দমত লেখক কারা? ৫। লেখা না পড়ে ফেরত পাঠাতেন কেন? ৬। কি ভাবে নিধিরাম সম্পাদক হয়েছিলেন? ৭। সম্পাদকের আসল নাম কি? ৮। কে কোন্ স্কুলে পড়ত? ৯। গল্পের শেষের দিকে কি হল? ১০। গল্পটি হাসির না অন্য ধরনের তা বল।

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

সমরেশ বসু



[**সমরেশ বসু :** ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। এঁর রচিত গঙ্গা, বি. টি. রোডের ধারে……প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। কালকূট ছদ্মনামে ইনি অমৃত কুম্ভের সন্ধানে গ্রন্থখানি লিখে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন আনেন। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের পর এঁর খ্যাতি ও সাহিত্য সমধিক। দুর্ভাগ্য আমাদের ইনি ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে পরলোক গমন করেন।]

ঊনিশশ' সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকের কথা। আমি তখন বছর বারোর ছেলে। পড়ি ক্লাশ সিক্সে। থাকতাম মামাবাড়িতে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক মহকুমা শহরে। নাম পিরোজপুর। দাদামশাই ছিলেন মোক্তার। আমাদের পাড়া ছিল একেবারে শহরের পূর্বপ্রান্তে। পাড়ার শেষে খেলার মাঠ। তারপর মস্ত বড় এক শ্যাওলাভরা পুকুর। পুকুরের ওধারে আঁশস্যাওড়ার জঙ্গল, বাঁশ-ঝাড় আর বুনো ঝোপ। এছাড়া কয়েকটা ঢ্যাঙা তালগাছও ছিল। সাপ-শেয়াল-গোসাপ আর গন্ধগোকুলের আস্তানা ছিল বলেই আমরা পুকুরের ওধারে যেতাম না।

সেই জঙ্গলে বাঁশঝাড়ের সামনের দিকে এক পড়ো পড়ো খোড়ো ঝুপরিতে থাকত এক থুত্থুরে বুড়ি। মাথা ভরে সাদা চুলের জট। সারা গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। পরনে একফালি ট্যানা। ছানিপড়া আঁশটে চোখ। ভাঙা শিরদাঁড়া। আধখানা হয়ে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে চলাফেরা করত।

পাড়ার বড়দের মুখে শুনেছি, ওর স্বামী দূরের চাষীদের গ্রামে গিয়ে পুজোআচ্চা করত। যাকে বলে পুরোহিত। তাকে অবশ্য

আমরা দেখিনি। শুনেছি, এক ঝড়জলের রাতে ধানখেতের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরবার সময় মাথায় বাজ পড়ে সে মারা যায়।

পাড়ার সবাই বুড়িকে 'কালোর মা' বলে ডাকত। খুব ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসছি ওকে! একসময় তকলিতে সুতো কেটে পৈতে তৈরি করত। তারপর আরো বুড়ি হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত। তাছাড়া, পুকুরের কাছে গেলেই দেখতে পেতাম ওকে। পুকুরের হাঁটুডুব জলে দাঁড়িয়ে মাটির কলসীতে জল ভরছে কিংবা কলমী শাক তুলছে। পাড়ে ফাঁকা জায়গায় রোদ্দুরে খুঁঙেপেষে আচার কিংবা মেটে বাসনে কাসুন্দি শুকুতে দিচ্ছে। ঘুরঘুর করছে ঝোপেঝাড়ে। আর সেইসঙ্গে অনর্গল আপনমনে বকবক করছে।

কালোর মাকে দেখলেও কালোকে আমি দেখিনি। কিংবা দেখলেও মনে নেই। দাদামশাই বলেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ঊনচল্লিশ সালে কালো পল্টনে নাম লিখিয়ে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে যুদ্ধ করতে যায়। তারপর কিছুদিন বাদেই আসে দুঃসংবাদ। ফ্রন্টে কালো মারা যায় কামানের গোলার আঘাতে।

কালো ছাড়া তিনকুলে কেউ ছিল না বুড়ির। মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রামটা নিয়ে আসে হরেন পিওন। হরেনের সন্দেহ হয়! টেলিগ্রামে নিশ্চয়ই কিছু দুঃসংবাদ আছে। তখন টেলিগ্রামটা নিয়ে সে যায় রমেশ চৌধুরীর কাছারিতে। রমেশ চৌধুরী আমাদের পাড়ার সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। শহরের নামকরা উকিল। টেলিগ্রামের খাম খুলে রমেশ চৌধুরীর তো আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ে। কি করে তিনি নিজ মুখে এরকম একটা খবর দেবেন কালোর মাকে। তখন পাড়ার বয়স্কদের ডাকলেন। সবাই মিলে ছোটখাট একটা মিটিং করল। তারপর ঠিক হল, কালোর মাকে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ জানানো হবে না। আর ক'দিনই বা বাঁচবে বুড়ি।

বুড়ি দিনমান খোড়ো ঝুপরির দাওয়ায় হাঁ করে বসে থাকত। দিনের পর দিন। কখন কালো ফিরবে এই আশায়। রাতেও টেমি হাতে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াত। যাতে কালো এলে আলো ধরে তাকে ঘরে নিয়ে যাবে। ওদিক দিয়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ চাষীরা গ্রামে ফিরত। তাদের ধরত বুড়ি। শুধোত, 'হ্যাঁগো বাছা, আমার ছেলে কালো কবে যুদ্ধ থেকে ফিরবে শুনেছ কিছু?'—তারা বলত, 'না তো।'

এইভাবে দিনের পর দিন গড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছরও কেটে গেল। বুড়ি ক্রমশঃ বুড়ো হচ্ছে। শেষে মরিয়া হয়ে আমাদের পাড়ার ভেতর ঢুকে এবাড়ি সেবাড়িতে হানা দিতে লাগল। ধরত একে ওকে। বলত, 'একটা চিঠি লিখে দাও না কালোকে। লিখো, কতদিন ওকে দেখি না। মার প্রাণ তো, বুঝতেই পারছো। ছুটি নিয়ে একবার যেন আমাকে দেখে যায়। কবে চোখ বুজি।'

আশ্বাস দিত কেউ কেউ। বলত, 'ঠিক আছে লিখে দেব।'

কেউ কেউ আবার খাতা পেন্সিল নিয়ে বসত, বলত ব্যস্তসমস্ত হয়ে, 'চটপট বলো, কালোর মা, কি লিখতে হবে ?'

শেষের দিকে বুড়ি কেমন খ্যাপাটে হয়ে গিয়েছিল। শরীরটা ডোঙার মত বেঁকে গিয়েছিল। তবু লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে আসত পাড়ায়। ততদিনে বুড়িকে নিয়ে পাড়ার সবাই তিতিবিরক্ত। কার এত সময় আছে যে বুড়িকে বসিয়ে বকবক করবে! বলত সবাই, 'চিঠি আসছে না তাতে এত ভাবছ কেন তুমি। যুদ্ধ শেষ হোক। দেখো, কালো ঠিক ফিরে আসবে।'

ততদিনে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেছে। বুড়ি পাড়ার লোকের কথায় কি বুঝত কে জানে।

আপন মনে বিরবির করতে করতে নিজের ঝুপরির দিকে ফিরে যেত। বলত ঝাপসা গলায়, 'কি যে এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে—'

শেষপর্যন্ত এক বর্ষার রাতে বুড়ি সাপের কামড়ে মারা যায়। দু'তিনদিন বাদে পাড়ার লোকেরা ওর বাসি মড়া আবিষ্কার করে ঝুপরিতে। সেই থেকে চোরটোর ছাড়া আর কেউ পুকুরের ওধারে যেত না।

তার বছরখানেক পরের কথা। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বড়মামা পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে আসার সময় আমার জন্য একটা ক্যাম্বিসের বল নিয়ে এসেছিল। সেদিন পাড়ার ছেলেরা মিলে পুকুরধারের মাঠে ক্রিকেট খেলতে গেছি। সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে পড়াশুনো করার তাড়া নেই। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে চারদিক কালচে হয়ে এসেছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন এত জোরে ব্যাট চালাল যে ক্যাম্বিসের বলটা পুকুর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল

ওধারের জঙ্গলে। বলটা আমার। সুতরাং, ওটা খুঁজে বের করবার জন্য গরজটাও আমার ; কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বল খুঁজতে পুকুরের ওধারে যেতে রাজী হল না। বাধ্য হয়ে একাই ছুটলাম ওদিকে।

ভালুকে অন্ধকার নেমেছে। ওধারে গিয়ে আঁশস্যাওড়ার জঙ্গলের আশেপাশে বলটা খুঁজছি। ছোট বল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বলটা পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল—বাঁশঝাড়ের ওধারে ঝুপরির কাছে একটা টৌমির আলো চলাফেরা করছে। ভাবলাম, বোধহয় চোরটোর ঘোরাফেরা করছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মড়মড়ে আওয়াজ। ভয়ে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিল। চেঁচিয়ে উঠলাম 'কে, কে ওখানে ?'

আওয়াজটা আচমকা থেমে গেল। কিন্তু আলোর চলাফেরা, চলছিল সমানেই। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন ঝাপসা গলায় বলছে, 'কিরে, কালো ফিরে এলি নাকি বাবা ?'

মুহূর্তে আমার দু'পায়ের গোড়ালি হরিণের মত শক্ত হয়ে উঠল। বল খোঁজা মুলতুবি রেখে আমি দৌড় লাগালাম। পুকুর পাড়ে এসে পেছন ফিরে একবার তাকাতে দেখি খোড়ো ঝুপরির দাওয়ার সামনের ফাঁকা জায়গায় টৌমি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক থুত্থুরে বুড়ি। বলছে, 'কে যাচ্ছ বাছা ! আমার কালোর কোন খবর জানো ?'

প্রাণপণে ছুটছি। মাঠ পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকে এবাড়ির ছাঁচতলা ওবাড়ির বাগান পেরিয়ে অবশেষে বাড়িতে এসে পেঁছুলাম। যুদ্ধ আমি দেখি নি কখনো। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কতটুকু সত্য আর কতটুকুই বা দেখা-শোনার ভুল তা বলতে পারব না। তবে যুদ্ধ যে কত মারাত্মক, কি ভয়ঙ্কর দুঃখের সেটা সেই ছেলেবয়সেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

[পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত]

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল। ২। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ? ৩। বাল্যকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ? ৪। 'কালোর মা' কাকে বলা হত ? ৫। দাদামশাই কি বলেছিলেন ? ৬। রমেশ চৌধুরী কে ? ৭। কে কাকে আশীর্বাদ করেছিল এবং কেন ? ৮। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাকে বলে ? ৯। বড় মামা কি এনেছিলেন ? ১০। গল্পের শেষের দিকের ঘটনার উল্লেখ কর।